তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

আলোর মিছিল

প্রথম খণ্ড

ডঃ আবদুর রহমান রাফাত পাশা

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন কাহিনী

আলোর মিছিল

প্রথম খন্ড

মূল

ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)

বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ

অনুবাদ

হাফেজ মাওলানা মাসউদুর রহমান

লেখক ও অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১, বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

আমি জানিনা রচনা ইত্যাদিকে কেন কারো নামে উৎসর্গ করা হয় এবং কবে থেকেই বা এর প্রচলন। দেখি, সবাই এটা করে তাই আমিও করছি।

যার কাছে আমার লেখালেখির জন্ম, যার সযত্ন তারবিয়তে এর বিকাশ ও বর্ধন, সেই আশ্চর্য প্রতিভা, অসম্ভব ভালো এবং 'নিঃস্বার্থ' একজন মানুষ—হযরত মাওলানা ইসমাঈল সাহেব **বরিশালী হুযূরকে**।

—অনুবাদক

লেখকের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হে আল্লাহ! আমি নির্ভরযোগ্য সুনির্বাচিত তাবেঈদের এমন প্রাণ উজার করে ভালোবাসি, যার চেয়ে অধিক ভালো আমি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীদের ছাড়া আর কাউকেই বাসিনা।

সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমাকে মহাত্রাসের দুর্দিনে 'এইদল' (তাবেঈগণ) অথবা 'ঐদলের' (সাহাবায়ে কেরাম রাযিঃ) যে কোন একজনের পাশে একটুখানি স্থান দিয়ো।

তুমি তো জানো আমি শুধু তোমার জন্যই তাদের ভালোবাসি ইয়া আকরামাল আকরামীন।

—আবদুর রহমান

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজ্জের সময় বাইতুল্লাহ্ শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট একটি লাইব্রেরী থেকে 'ছুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবাহ্' নামক একটি চমৎকার কিতাব ক্রয় করি। নামায, তাওয়াফ, তিলাওয়াত ও হজ্জের অন্যান্য কার্যাদির ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পেতাম কিতাবটি নিয়ে বসে যেতাম, এমনকি মিনা, আরাফাহ্ ও মুজদালিফার ব্যস্ততম দিনগুলোতেও কিতাবটি সাথে রেখেছি এবং সামান্য সুযোগেও সেটা পড়ার কাজ অব্যাহত রেখেছি।

কিতাবটি আমার এতই পছন্দ হয়েছে যে, মদীনা শরীফে যখন এই একই কিতাব মক্কা শরীফের চেয়ে দশ রিয়াল কমে পেলাম, তখন এক স্নেহাস্পদকে হাদীয়া দেওয়ার জন্য আরো একটি কপি ক্রয় করলাম। এই পবিত্র সফরে অনেক মুরুব্বীকেও এর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি। তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং বঙ্গানুবাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার দরুন কখনোই এ দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার হিম্মত হয়নি।

পরবর্তিতে যখন মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলো, তখন তাঁকে এটি অনুবাদের জন্য অনুরোধ করলে তিনি জানালেন এর একাধিক অনুবাদ বাজারে আছে, তবে 'ছুওয়ারুম মিন হায়াতিত্তাবেঈন' নামে এই লেখকেরই অন্য আরেকটি চমৎকার রচনা আছে। আমি কিতাবটি দেখলাম, দেখে সাথে সাথে মাসউদ ভাইকে অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি অল্প কয়েক দিনেই প্রথম খণ্ডের কিছু অংশ অনুবাদ করে আমাকে দিলেন। আমি দেখলাম যে, অনুবাদটি এতই চমৎকার হয়েছে যে, মূল কিতাব পড়ার আর অনুবাদ পড়ার মাঝে কোন ব্যবধান খুঁজে পেলাম না।

আমার ধারণা বর্তমান লোভ–লালসা, হিংসা–বিদ্বেষ, নীচতা ও বর্বরতার এই ঘন অমানিশায় আচ্ছন্ন পৃথিবীতে 'আলোর মিছিল' আশার আলো ফুটাতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ!

বইটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করেছি। তারপরও কোন অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে, আমাদের জানানোর অনুরোধ রইলো।

কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আমরা বইটির মূল্য পাঠকদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ্ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর এ সকল প্রিয় বান্দার জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান খান

জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া

৩–৪, কোতোয়ালী রোড

ইসলামপুর, ঢাকা–১১০০

ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রঃ)

• জন্ম—১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে।

জন্মস্থান—সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের 'আরীহা' শহর। সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেন 'হলব' শহরের খসরুবিয়া বিদ্যালয় থেকে। উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রী আল-আজহারের 'উসূলুদ্দীন' (ধর্ম) অনুষদ থেকে। সব শেষে কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে অনার্স, মাষ্টার্স ও পি.এইচ.ডি করেন।

• কর্মজীবন শুরু করেন শিক্ষক ও পরীক্ষক হিসাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নিযুক্ত হন সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরবী ভাষার প্রধান পরিদর্শক (Inspector)। অতঃপর দামেস্কের উলূমে আরাবিয়ার প্রকল্পাধীন 'দারুল কুতুব' এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পাশাপাশি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের প্রভাষক।

• সৌদিয়ায় বদলি হয়ে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। এখানে তিনি ইসলামী সাহিত্য কারিকুলাম এবং 'অলঙ্কার ও সমালোচনা' বিভাগের চেয়ারম্যান, 'মজলিসে ইলমী'র (শিক্ষা পরিষদ) আজীবন সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব ডঃ আবদুর রহমান ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উদ্বোধক নন বরং তাঁর পূর্বে বহু চিন্তাশীল ও গবেষকই এ কাজ করেছেন.... কিন্তু একমাত্র তিনিই পূর্বসূরীদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও স্বার্থক রূপায়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি একাই সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুলেছিলেন পরিপূর্ণ ইসলামী ভাবধারা।

তিনি সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর সভাপতিত্বে 'রাবেতা আল আদাবুল ইসলামী'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সহ-সভাপতি। এছাড়াও বহু সংস্থা, সংঘ ও কমিটির তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় ও প্রিয় সদস্য।

• মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই শুক্রবারে তুর্কিস্তানের ইস্তাম্বুল শহরে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দাফন করা হয় সেখানেরই 'ফাতেহ' গোরস্তানে। যেখানে সমাহিত রয়েছেন অনেক সাহাবী ও তাবেঈ। জীবদ্দশায় যাদেরকে তিনি সর্বাধিক ভালবাসতেন এবং যাদের পাশে একটু স্থান পাওয়ার ব্যাকুল প্রার্থনা করতেন মহান প্রভুর দরবারে, আল্লাহ সেই প্রার্থনা কবুল করে পৃথিবীতেই তাঁর মৃতদেহকে স্থান দিয়েছেন মহান সাহাবী ও তাবেঈদের কবরের পাশে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা—চিরস্থায়ী জান্নাতেও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী বানিয়ে দিন। আমীন !

পূর্বাভাষ

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন 'আলোর মিছিল–১' সাতজন তাবেঈ–র রূপান্তরিত বাংলা জীবন কথা।

মূল গ্রন্থকার বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক, গবেষক, লেখক মরহুম ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা। মূল গ্রন্থের নাম 'ছুওয়ারুম্ মিন হায়াতিত্ তাবেঈন'। লেখক তাঁর কালজয়ী এই গ্রন্থে শুধু কেবল নিরেট সত্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোকেই স্থান দিয়েছেন। সুতরাং আরব বিশ্বে ব্যাপকহারে সমাদৃত ও বহুল পঠিত এই রচনা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এটি সব ধরনের বাহুল্য, ভুল ও দুর্বল তথ্য মুক্ত একটি অমর ও অনবদ্য গ্রন্থ।

এতদসত্ত্বেও উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন এ গ্রন্থের হৃদয় জুড়ানো ভাষা ও আবেগ জাগানো এক অনন্য রচনাশৈলী পাঠককে আলোড়িত করে তীব্রভাবে। পাঠক কখনো হন মুগ্ধ, কখনো আবার ভীষণ বেদনাহত। কখনো তার হৃদয় কূলে আছড়ে পড়ে অনুশোচনার ঢেউ। কখনো ভেসে যায় তার দু'চোখের কূল। লেখকের অপূর্ব বর্ণনাভংগি পাঠককে বইয়ের পাতা থেকে একটানে তুলে নিয়ে যায় সেই সুদূর অতীতে, সোনালী যুগের এক সোনালী সকালের পবিত্র আসরে। এভাবেই এ গ্রন্থের জীবনীগুলো পাঠক শুধু পাঠই করেন না বরং সেই সব জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করতে থাকেন স্বচক্ষে।

এই গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডে যেসব মহামনীষীর জীবন কথা আলোচিত হয়েছে, ইসলামে তাঁদেরকে আখ্যায়িত করা হয় 'তাবেঈন' বলে। তাঁদের নামের শেষে বলা হয় 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি'। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর রূহের উপর।

মূলতঃ এ পৃথিবীর যাবতীয় কল্যাণকর ও উত্তম আদর্শের যিনি মূর্ত প্রতীক, যিনি সততা, সাধুতা, সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকামিতাসহ যাবতীয় উত্তম গুণ–বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি মনুষ্যত্বের নির্মাতা, তিনি হলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যুগস্রষ্টা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এই মহামানব মাত্র তেইশ বছরের নবী জীবনে আসমানী অহীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিলেন এমন একদল মানুষ, যারা আজ পর্যন্ত এবং অনাগত ভবিষ্যতের মহাপ্রলয় পর্যন্ত এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাদুতুল্য শিক্ষা আর পরশতুল্য সান্নিধ্য যাদেরকে এনে দিয়েছিলো 'সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি'র বিরল সম্মান আর তাঁদের যুগকে দিয়েছিলো 'সোনালী যুগ'–এর আখ্যা। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ শিক্ষা ও সান্নিধ্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত 'তাঁরা' এবং তাঁদের 'যুগ' ছিলো 'বর্বর' বলে অভিযুক্ত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানদীপ্ত এইসব সহচর, যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা ও সান্নিধ্যের ঈমানী সুবাস নিয়েই যাদের মৃত্যু হয়েছিলো, তাঁদেরকেই বলা হয় সাহাবী। তাঁদের নামের শেষে বলতে হয় 'রাযিয়াল্লাহু আনহু বা আনহা'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর শিক্ষায় জীবনগড়ার একমাত্র মাধ্যম ছিলেন তাঁরই হাতেগড়া সাহাবী জামাত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাওয়ার ফলে তাবেঈগণ একমাত্র মাধ্যম সেই সাহাবী জামাতকেই আঁকড়ে ধরেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় আলোকিত করে তোলেন নিজেদের জীবন ও মনন। কোন তাবেঈ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য পাননি। তাঁরা পেয়েছিলেন 'আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'–এর সরাসরি শিক্ষা ও সাহচর্য। এজন্যই তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হ'তে পারেননি, পেরেছিলেন তাঁর সহচরদের সহচর হতে। এভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেলেও সাহাবায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় তাবেঈদের মাঝেও নিখুঁতভাবে গড়ে ওঠে সমস্ত ঈমানী গুণ ও বৈশিষ্ট্য। ফলে তাঁরাও দিনের আলো আর রাতের আঁধারে

সমানভাবে আল্লাহকে ভয় করতেন। দুর্দিনে আর সুদিনে সমানভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। আমীর ও ফকির, শাসক ও শাসিত সকলের সামনেই তাঁরা নির্ভিকভাবে হকের উচ্চারণ করতেন। এসব ঈমানী বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাহাবীগণের পরে উম্মতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন তাবেঈগণের। যে কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। তিনি বলেছেন—

"আমার যুগটাই সর্বশ্রেষ্ঠ তারপর পরবর্তী যুগ তারপর তারও পরের যুগ......"

মূল আরবী বইটির উচ্চ সাহিত্যমান ও রস পরিপূর্ণরূপে ভাষান্তর করা একেবারেই অসম্ভব। যে কোন অনুবাদ সম্পর্কে জ্ঞানী-গুণীরা এ ধরনের একটি কথা বলে থাকেন। কথাটি নিঃসন্দেহে সত্য বলেই আমি বিশ্বাস করি। তবে এই সত্যটি মহাসত্যে পরিণত হয় যদি মূল লেখক আর অনুবাদকের ব্যবধান হয়ে যায় আকাশছোঁয়া। সবকিছু স্বীকার করে নিয়ে বিনীতভাবে জানাচ্ছি—বাংলাভাষার রীতি ও গতি ঠিক রেখে যতদূর আমার পক্ষে সম্ভব, অনুবাদকে মূলের কাছাকাছি নেওয়ার চেষ্টা করেছি। জানিনা তা কতটুকু সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রিয় পাঠক! বিশ্বাস করুন আমি চেষ্টা করেছি......। যে কোন ধরনের ত্রুটি কিংবা প্রয়োজনীয় পরামর্শ কেউ জানালে তা শুকরিয়ার সঙ্গে গৃহীত হবে।

বইটি যিনি আমাকে অনুবাদের প্রস্তাব করেছিলেন এবং এখন সেই অনুদিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্যও যিনি নিজেই এগিয়ে এসেছেন, তিনি মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান খান। আমি ভীষণভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এর উত্তম বিনিময় তিনি আল্লাহর কাছে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

জীবনের প্রথম বই প্রকাশের এই আনন্দঘন মুহূর্তে একজন ভালো মানুষের কথা মনে পড়ছে। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর (দর্শন) দেওয়ান আজিজুল ইসলাম সাহেব। সীমাহীন ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই বইয়ের প্রথম তিনটি জীবনী

দেখে বেশ কিছু ভালো পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি দু'আ করি 'আল্লাহ্ তাঁর তাকওয়া ও পরহেযগারীর উন্নতি দান করুন।'

আমার একান্ত স্নেহের মাহমুদ সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখার অর্ধেকেরও বেশী অংশের অনুলিপি প্রস্তুত করে দিয়েছে। আল্লাহ্ ওকে হক্কানী আলেম হওয়ার তাওফীক দান করুন।

আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা বুদ্ধি, পরামর্শ ও উৎসাহ দানের মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

তাবেঈদের জীবনী অনুবাদের মহত এই কাজটি করতে গিয়ে বুকের মধ্যে বারবার দুরু দুরু করেছে। সকল অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ যখন কাজটি করার তাওফীক দিয়েছেন এখন মেহেরবানী করে তিনি একে অনুবাদক সহ সকল পাঠকের জন্য কল্যাণকর হিসাবে কবুল করে নিলেই হবে চরম স্বার্থকতা।

হে আল্লাহ! তুমি মেহেরবানী করে আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী ও সন্তান সহ সকলকেই মৃত্যুপরবর্তী অনন্ত অসীম জীবনের আমলে ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করো। এ বইটিকে প্রেরণা হিসাবে কবুল করে নাও। আমীন!

বিনীত অনুবাদক
মাসউদুর রহমান
আল্ মা'হাদুল ইসলামী বাংলাদেশ
বাড়ী-১৪, রোড-১৯, সেক্টর-৪
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
‘আতা ইবনে আবী রাবাহ (রঃ)	১৩
‘আমের ইবনে ‘আবদুল্লাহ তামীমী (রঃ)	২৭
‘উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর (রঃ)	৪৫
রাবী‘ ইবনে খোসাইম (রঃ)	৬৩
ইয়াস ইবনে মুআবিয়া (রঃ)	৭৯
‘উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) এবং তাঁর পুত্র আবদুল মালিক (রঃ)	৯৭

আতা ইবনে আবী রাবাহ (রঃ)

আমি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র তিনজন ছাড়া আর কাউকে ইল্‌ম শিখতে দেখিনি। আতা...... তাউস....... ও মুজাহিদ.......

—'সালামা ইবনে কুহাইল'

‘আতা ইবনে আবী রাবাহ (রঃ)

এখন আমরা হিজরী ‘৯৭ সালের ১০ই জিলহজ্জে।

আমাদের সামনে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর বাইতুল্লাহ! যা এখন তরঙ্গায়িত হচ্ছে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে অলি-গলি, গিরিপথ ও রাজপথ পেরিয়ে আসা অগণিত মানুষের ভিড়ে।

এখানে, এই কা‘বা শরীফে যেন আজ ঢল নেমেছে মানুষের। বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত তারা ছুটে আসছে।

আসছেই। যেন এ আসার শেষ হবে না কোনদিন .....

পায়ে হেঁটে আসছে .....

সওয়ার হয়ে আসছে .....

আসছে নারী, পুরুষ .....

যুবা ও বৃদ্ধ .....

নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ।

এদের মধ্যে কোন ভেদ রেখা নেই,

এদের শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, আরব-অনারব, রাজা-প্রজা সব এখন একাকার।

এদের প্রত্যেকের পরিচয় একটিই—আবদুল্লাহ। (আল্লাহর বান্দা)

এদের সকলের আদর্শও একটিই—রাসূলুল্লাহ (সা.)।

এদের সকলের জীবন বিধানও একটিই—কালামুল্লাহ। (কুরআন)

এরা সকলেই নিজেদের একমাত্র প্রভুর দরবারে আজ সমবেত।

এদের সর্বাঙ্গ এখন তাঁরই ভয়ে প্রকম্পিত।

প্রত্যেকের মুখেই এখন “লাব্বাইক”এর সুর ধ্বনিত ও গুঞ্জরিত।

সকলেরই হৃদয় এখন মাগফিরাতের প্রত্যাশায় আলোড়িত।

* * *

আর ঐ যে তাওয়াফ করছেন, তিনি হলেন বিখ্যাত খলীফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক।[১]

আহা! তাঁর শরীরেও ঐ একই পোষাক—একপ্রস্থ চাদর ও ইযার। মাথায় তাঁর শাহী মুকুট নেই, শরীরে নেই শাহেনশাহী পোষাক। তিনিও সাধারণ প্রজাদের মত খোলা মাথায় ও অন্যান্য মুসলিম ভাইয়ের মত সাদা-সিদে পোষাকে বাইতুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করছেন।

পিছনে রয়েছে তাঁরই দুই পুত্র।

পূর্ণিমা চাঁদের মত ফুটফুটে দুটি বালক।

যেন সদ্যফোটা গোলাপ পাপড়ীর মত সজীব ও মসৃণ।

খলীফা তাওয়াফ শেষ করেই এক কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ "উনি কোথায়?"

ঃ "ঐ যে নামায পড়ছেন ...."

—মসজিদুল হারামের পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করে সে বললো।

খলীফা ইঙ্গিত করা সেই জায়গার দিকে রওনা হলেন। তাঁর পিছে পিছে তাঁর দুই ছেলে।

খাস কর্মচারীরা চাইলো তাঁর অনুসরণ করবে, পথের ভিড় সরিয়ে দেবে। কিন্তু খলীফাই নিবৃত্ত করলেন ওদেরকে।

তিনি বললেন—

"এই পবিত্রস্থানে রাজা-প্রজা সবাই সমান। তাকওয়ার মর্যাদা ছাড়া এখানে অন্য কিছু বিবেচ্য নয়। হতে পারে এখানের অনেক এলোমেলো কেশ ও মলিন বেশধারী মুত্তাকীর এমন মর্যাদা আছে আল্লাহর কাছে, যা কোন রাজা-বাদশার নেই।"

একথা বলেই তিনি সেই নামাযরত মানুষটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তখন পর্যন্ত তাঁকে নামাযেই মশগুল দেখতে পেলেন। দেখলেন তিনি কখনো রুকুতে, কখনো সেজদায় একেবারে যেন ডুবে যাচ্ছেন।

দেখলেন—বহু মানুষ তাঁর জন্য বসে আছেন, তাঁর পিছনে, ডানে এবং বামে।

---

[১] সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক—উমাইয়া বংশের একজন বিখ্যাত খলীফা। তার পরেই ইসলামী জাহানের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন খলীফা 'উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)।

খলীফা বসলেন। সেখানেই। সেই সবলোকের পেছনে, যেখানে মজলিস শেষ হয়েছে।

পুত্র দু'জনকেও তিনি সঙ্গে বসালেন।

কুরাইশী দুই কিশোর ভাবতে শুরু করলো—"ইনি কে? খোদ আমীরুল মুমিনীন যার জন্য আম জনতার সঙ্গে বসে অপেক্ষা করছেন? !"

* * *

এক সময় নামায শেষ হলো।

তিনি জনতার দিকে ঘুরে বসলেন। খলীফা তাঁকে সালাম দিয়ে নিজেই কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে এক একটি করে হজ্জের মাসায়েল জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও এক একটি করে সকল প্রশ্নের জবাব দিলেন। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে সম্ভাব্য প্রশ্নের সব পথ বন্ধ করে দিলেন। প্রতিটি জবাবের দলীল হিসাবে তুলে ধরলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস।

প্রশ্ন শেষ হলে খলীফা "জাযা–কাল্লা–হু খায়রান" বলে তাঁকে ধন্যবাদ দিলেন।

এরপর দুই পুত্রকে নিয়ে "সাঈ"র উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথে বালকদ্বয় শুনতে পেলো—

"ভাইসব! এই অঞ্চলের একমাত্র মুফতী 'আতা ইবনে আবী রাবাহ। তাঁর অনুপস্থিতিতে এ দায়িত্ব আবদুল্লাহ ইবনে আবী নাজীহ এর। এ দু'জন ছাড়া এখানে অন্য কেউ ফত্ওয়া প্রদান করতে পারবে না।"

এ ঘোষণা শুনে একপুত্র খলীফাকে জিজ্ঞাসা করলো—

"আমীরুল মুমিনীনের লোকেরাই ঘোষণা দিচ্ছে—'আতা ইবনে আবী রাবাহ এবং তাঁর নায়েব ছাড়া কাউকে ফত্ওয়া জিজ্ঞাসা করা যাবে না, তাহলে আমরা কেন এই লোকটির কাছে গেলাম, খলীফার প্রতি যার যথার্থ সম্মান ও উপযুক্ত মর্যাদাবোধ নেই?"

সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক পুত্রকে বললেন—

"বেটা! এই যে মানুষটিকে তুমি দেখলে এবং যার সামনে আমার

তুচ্ছতা প্রত্যক্ষ করলে তিনিই হলেন মসজিদুল হারামের প্রধান মুফতী 'আতা ইবনে আবী রাবাহ। তিনিই এই মহান মসনদে 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সুযোগ্য উত্তরসূরী।"

অতঃপর তিনি আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বললেন—

"বাবারা! তোমরা ইল্‌ম শিক্ষা কর। ইলমের কারণেই তুচ্ছ ব্যক্তি মহান হয়। অখ্যাত ব্যক্তি আরোহণ করে খ্যাতির শীর্ষচূড়ায়। ক্রীতদাসরাও হয়ে যায় রাজা-বাদশার মত উচ্চ মর্যাদাবান।"

* * *

সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক ইলম সম্পর্কে মোটেও অতিরঞ্জিত কিছু বলেননি।

কারণ খোদ আতা ইবনে আবী রাবাহ ছিলেন শৈশবে এক মহিলার ক্রীতদাস।

একমাত্র ইলমের কারণে একজন হাবসী গোলাম কী অপূর্ব মর্যাদাই না পেয়েছেন!

তিনি শৈশব থেকেই ইলমের প্রতি ছিলেন ভীষণ অনুরাগী। তখন থেকেই তিনি সময়কে ভাগ করে নিয়েছিলেন তিন ভাগে।

এক ঃ মনিবের জন্য। এসময়ে তিনি মনিবের হক আদায়ে এবং তাঁর সর্বোত্তম সেবায় নিবেদিত থাকতেন।

দুই ঃ আল্লাহর জন্য। এসময়ে তিনি সম্পূর্ণ মনোযোগ, ইখলাস ও ভক্তির সঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

তিন ঃ ইলমের জন্য। এসময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিত সাহাবীদের সান্নিধ্যে কাটাতেন। তাদের বিশাল (ইলমের) চাক থেকে খাঁটি মধু আহরণ করতেন।

তিনি যাদের কাছে ইল্‌ম শিখেছেন, তারা হলেন হযরত আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। ফলে ফিক্‌হ ও হাদীসের অসামান্য ইল্‌মে তাঁর হৃদয় ছিলো ভরপুর।

* * *

মক্কাবাসীনী মনিব যখন বুঝতে পারলেন—তার ক্রীতদাস আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং ইল্‌মের পথে জীবনকে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে, তখন তিনি মনিব হিসাবে নিজের হক প্রত্যাহার করে নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাকে পূর্ণরূপে আযাদ করে দিলেন। এই আকাঙ্খায় যে, তার দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ হবে।

সেদিন থেকেই 'আতা ইবনে আবী রাবাহ "বাইতুল্লাহ"কেই বানালেন নিজের ঠিকানা।

একেই বানালেন মাদরাসা।

একেই বানালেন ইবাদতখানা।

এমনকি ঐতিহাসিকগণ বলেন—"প্রায় কুড়ি বছর ধরে মসজিদুল হারামের মাটিই ছিলো 'আতা ইবনে আবী রাবাহ' এর বিছানা।"

* * *

'আতা ইবনে আবী রাবাহ ইল্‌মের এমন শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করেছিলেন, যেখানে সমকালীন দু'একজন ছাড়া আর কেউই পৌঁছুতে পারেননি।

একবার বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) মক্কায় এলেন.....বহু মানুষ তাঁর কাছে ফত্‌ওয়ার জন্য ভিড় করলেন। এতে তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন—

"হে মক্কার লোকেরা! আমি অবাক হচ্ছি যে, 'আতা ইবনে আবী রাবাহ থাকা সত্ত্বেও তোমরা ফত্‌ওয়ার জন্য এসেছো আমার কাছে? !"

* * *

'আতা ইবনে আবী রাবাহ এর ছিলো দুটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, যা তাঁকে দ্বীন ও ইলমের সর্বোচ্চ মর্যাদার শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলো—

এক ঃ নিজের খাহেশাত ও প্রবৃত্তির উপর ছিলো তাঁর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। ফলে নফসকে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর উপভোগের সুযোগ তিনি কখনোই দেননি।

দুই ঃ নিজের সময়ের ব্যাপারে ছিলেন এমন কঠিন সচেতন যে অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজে তার সামান্যও ধ্বংস হতে দেননি।

কুফানগরীর একজন বিশিষ্ট আলিম ও আবিদ মুহাম্মদ ইবনে সূকাহ তাঁর একদল দর্শনার্থীকে বলেন—

"আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা শুনাবো যার দ্বারা তোমরা হয়ত উপকৃত হবে যেমন আমি হয়েছি?"

তারা সবাই বললেন—"অবশ্যই।"

মুহাম্মদ ইবনে সূকাহ—"একদিন 'আতা ইবনে আবী রাবাহ আমাকে বললেন—হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথাই বলতেন এবং শুনতেন। অপ্রয়োজনীয় কথা তারা মোটেও পসন্দ করতেন না।"

মুহাম্মদ ইবনে সূকাহ—"চাচা! তাঁদের দৃষ্টিতে "প্রয়োজনীয়" ও "অপ্রয়োজনীয়" কথার একটু ব্যাখ্যা দিবেন কি?"

'আতা ইবনে আবী রাবাহ—"তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় কথা ছিলো পাঁচ ধরনের—

(ক) কিতাবুল্লাহ্‌র তেলাওয়াত ও উহার আলোচনা .....

(খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রেওয়ায়াত ও উহার আলোচনা.....

(গ) সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ .....

(ঘ) খোদায়ী ইলমের আলোচনা

(ঙ) জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় কথা .....

এগুলো ছাড়া আর সব কথাই ছিলো তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয়।

এরপর তিনি আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—

তোমরা কি এসব আয়াত অস্বীকার করবে—

إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ - كِرَامًا كٰتِبِيْنَ -

"অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছেন। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ।" —ইন্‌ফিতার ঃ ১০–১১

عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّالَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

"এবং তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছেন দু'জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" —কাফ ঃ ১৭–১৮

এরপর তিনি বললেন—

আমাদের কারো সম্মুখে যদি প্রতিদিনের আমলনামা প্রকাশ করা হয়, তবে কি সে নিজের অধিকাংশ বেহুদা আমল দেখে লজ্জিত হবে না?

সেকি আফসোস করে বলবে না—হায়রে! অধিকাংশ আমলই তো দ্বীন–দুনিয়ার সঙ্গে সংশ্রবহীন।

* * *

'আতা ইবনে আবী রাবাহ এর ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন বহু শ্রেণীর এমন অসংখ্য মানুষ যাদের মধ্যে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরাম, রয়েছেন বিভিন্ন পেশাজীবি, শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বর্ণনা করেন—

"আমি মক্কায় হজ্জ সংক্রান্ত পাঁচটি ভুল করেছিলাম, যেগুলো আমাকে সংশোধন করে দিয়েছিলেন জনৈক নাপিত।"

ঘটনাটি ছিলো এরকম—

আমি ইহরাম মুক্ত হবার জন্যে এক নাপিতের কাছে মাথা কামাতে গেলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—

ঃ "মাথা কামাতে কত নিবা?"

ঃ "হাদাকাল্লাহ! ইবাদতের মধ্যেও দামাদামি চলে? বসে পড়ো, তুমি যা পার দিয়ো।"

—বিস্মিত হয়ে নাপিত কথাগুলো বললো।

ভীষণ লজ্জিত হয়ে আমি বসে পড়লাম তার সামনে।

নাপিত ঃ "জানোনা এসময় কেবলামুখী হয়ে বসতে হয়?"

আরো একটি ভুল করাতে আমার লজ্জা আরো বেড়ে গেলো।

এরপর মাথার বাম দিক আমি তার সামনে এগিয়ে ধরলাম। এটাও সে সংশোধন করলো। বললো ডানদিকটা দাও।

সে মাথা কামাতে লাগলো আর আমি নীরবে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত রইলাম। কিন্তু না, সে আবারো মুখ খুললো—

ঃ "আরে! তুমি দেখছি একেবারে মুখ বন্ধ করে আছো? !"

ঃ "তাকবীর বলো।"

আমি তাকবীর বলতে লাগলাম। মাথা কামানো শেষ হয়ে গেলো। আমার গন্তব্যে ফেরার জন্য যেই রওনা হলাম সে জিজ্ঞাসা করলো—

ঃ "কোথায় যাচ্ছো?"

ঃ "আমার গন্তব্যে।"

ঃ "আগে দু'রাকাত নামায পড়ো, তারপর যেখানে খুশী যাও।"

আমি নামায পড়লাম। এরপর ভাবতে লাগলাম—একজন নাপিতের পক্ষে এসব কথা কি করে জানা সম্ভব?

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"হজ্জের এ বিষয়গুলো তুমি কার কাছে শিখেছো?"

সে বললো—"হায় আল্লাহ! আমি আবার শিখলাম কোথায়! আমি তো 'আতা ইবনে আবী রাবাহকে করতে দেখেছি। তাতেই বুঝেছি এটাই নিয়ম। তাই সবাইকে কথাগুলো সেদিন থেকে বলে বেড়াচ্ছি।"[১]

* * *

'আতা ইবনে আবী রাবাহ এর হাতে প্রচুর পার্থিব ধন ঐশ্বর্য এসে ধরা দিয়েছে কিন্তু তিনি অত্যন্ত কঠিনভাবে সেগুলো উপেক্ষা করেছেন, সামান্যতম ভ্রুক্ষেপও সেদিকে করেননি। সারাটা জীবন এতই সাধারণভাবে কাটিয়েছেন যে তাঁর পরনে থাকতো মাত্র পাঁচ দেরহাম মূল্যের একটি জীর্ণ পোষাক।

শাসকগোষ্ঠি তাঁকে শাসনকার্যে অংশীদার হতে বারবার অনুরোধ করেছেন কিন্তু তাদের দুনিয়া দ্বারা তাঁর দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় কখনোই তিনি সাড়া দেননি। তথাপিও ইসলামের কল্যাণ অথবা

---

১ ঘটনাটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত নয়।

মুসলমানদের কোন উপকারের সুযোগ হলে তিনি শাসকবর্গের দুয়ারে কড়া নাড়াতেন।

এ ব্যাপারে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত উসমান ইবনে আতা খুরাসানীর বর্ণনায় উঠে এসেছে। তিনি বলেন—

আমি পিতার সঙ্গে যাচ্ছিলাম খলীফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের উদ্দেশ্যে। যখন আমরা দামেস্কের কাছাকাছি পৌছলাম তখন হঠাৎ কালো গাধায় চড়া এক বৃদ্ধকে দেখলাম, যার শরীরে ছিলো মোটা বুননের পুরাতন এক জীর্ণ জোব্বা, আর মাথায় লেপটে ছিলো একটি চিটচিটে টুপি। তার পা দুটো ছিলো সাধারণ ও সস্তা রেকাবে আটকানো। এইসব দেখে আমি ফিক করে হেসে ফেললাম। পিতাকে বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম—

ঃ "এ আবার কে? !"

ঃ "চুপ কর গাধা! ইনি হলেন ফকীহ সম্রাট 'আতা ইবনে আবী রাবাহ....."

পিতার এই চোখ রাঙানো ধমক খেয়ে আমি থেমে গেলাম।

তিনি যখন আমাদের কাছাকাছি পৌছলেন, পিতা খচ্চর থেকে নামলেন আর তিনি নামলেন কালো গাধার পিঠ থেকে। অতঃপর তারা আলিঙ্গন করলেন উভয়ে উভয়কে। সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময় সেরে তারা আবার নিজ নিজ বাহনের উপর চড়ে বসলেন। তারা একসঙ্গে রওনা হলেন। চলতে চলতে তারা খলীফা হিশামের দুয়ারে গিয়ে থামলেন।

সামান্য অপেক্ষার পর তাদেরকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো।

পরে আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"এরপরে কী হয়েছিলো বলুন তো?"

তিনি জবাব দিলেন—

খলীফা হিশাম যখন জানলেন যে, 'আতা ইবনে আবী রাবাহ তাঁর দরজায় অপেক্ষা করছেন তখন তিনি নির্দেশ দিলেন—দ্রুত তাঁকে ভেতরে নিয়ে যেতে। খলীফা তাঁকে দেখামাত্রই "মারহাবা" "মারহাবা" বলে স্বাগতম জানালেন।

এইখানে বসুন..... এইখানে বলতে বলতে খলীফা তাঁকে একেবারে

নিজের সিংহাসনে নিয়ে বসালেন। এত কাছে যে, হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু লেগে গেলো।

রাজদরবারে উপস্থিত অভিজাত লোকেরা নিজেদের আলোচনায় মেতে ছিলেন কিন্তু অচেনা আগন্তুকের প্রতি বাদশার ভীষণ সমাদর দেখে তাদের কথা বন্ধ হয়ে গেলো।

হিশাম জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ "হে আবু মুহাম্মদ! আমি আপনার কী খেদমত করতে পারি?"

ঃ "আমীরুল মুমিনীন! হারামাইনের লোকদের প্রতি দয়া করুন! তাঁরা আল্লাহর প্রেমিক, রাসূলের প্রতিবেশী। সুতরাং তাদের খাদ্য ও পোষাক আশাকের সুব্যবস্থা করুন।"

ঃ "তাই করবো।"

খলীফা মঞ্জুর করলেন এবং কেরানীকে লিখে রাখার নির্দেশ দিয়ে বললেন—

"মক্কা-মদীনার লোকদের জন্য পূর্ণ একবছরের খাবার ও পোষাক মঞ্জুরীর কথা লিখে নাও।"

ঃ "আবু মুহাম্মদ! বলুন আর কি করতে হবে?"—খলীফার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

ঃ "আমীরুল মুমিনীন! হেজায ও নজদের লোকেরা হলো আরবের মূল ও আদিবাসী, তারা ইসলামের বীরসেনানী, তাদের সদকার উদ্বৃত্ত তাদের মাঝেই বিলিয়ে দিন।"

ঃ "ঠিক আছে, এখন থেকে তাই করা হবে। কেরানী! লিখে রাখো।"

ঃ "আবু মুহাম্মদ! আর কিছু?"

ঃ "হাঁ, আমীরুল মুমিনীন! সীমান্ত প্রহরীদের দিকে নজর দিন, ওরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে শত্রুর মুখোমুখী হয়, ইসলামের ধ্বংসকামীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাদের যদি ক্ষতি হয়ে যায় তবে সীমান্তের সকল চিহ্ন মুছে যাবে। সুতরাং আপনি মেহেরবাণী করে হুকুম দিন তাদের যেন বেতন ও রেশন পেতে কষ্ট না হয়, বিলম্ব না হয়।"

ঃ "তাই হবে, এখন থেকে বেতন ও রেশন তাদের কাছে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেয়া হবে।"

ঃ "আবু মুহাম্মদ! বলুন আর কি?"

ঃ "আমীরুল মুমিনীন! আপনার যিম্মী নাগরিকদের উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত করের বোঝা যেন না চাপানো হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।"

ঃ "গোলাম লিখে রাখো, সামর্থ্যের বাইরে যিম্মীদের কর উসূল করা হবে না।"

ঃ "আবু মুহাম্মদ! আর কিছু বলবেন?"

ঃ "হাঁ, আমীরুল মুমিনীন! আর একটি কথা, নিজের মধ্যে তাকওয়া ও পরহেযগারী অর্জন করুন।

ভুলে যাবেন না—আপনি পৃথিবীতে এসেছিলেন একা.....

আপনাকে এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে একাই.....

হাশরের মাঠে আপনাকে উঠানো হবে একা......

আল্লাহর সম্মুখে আপনাকে হিসাব দিতে হবে একা একাই......

আল্লাহর কসম! যাদেরকে আজ সঙ্গে দেখছেন, এরা কেউই আপনার সঙ্গী হবে না।"

কথাগুলো শুনে হিশামের মাথা নিচু হয়ে গেলো, অধোমুখী খলীফার দুই চোখ থেকে অঝোরধারায় অশ্রু ঝরতে লাগলো।

এরপর 'আতা ইবনে আবী রাবাহ উঠলেন সেখান থেকে, আমিও উঠে পড়লাম তাঁর সঙ্গে।

আমরা যখন সদর দরজার কাছে পৌছলাম তখন একটি থলে হাতে নিয়ে তাঁর পিছে এসে দাঁড়ালো এক কর্মচারী। সে থলেটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো—

"আমীরুল মুমিনীন আপনার জন্য এটা পাঠালেন......"

তিনি বললেন—

ঃ "অসম্ভব.......

وَ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আমি উহার জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পুরস্কার তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহর কাছে মওজুদ রয়েছে।"—শু'আরা ঃ ১০৯

বেটা! আল্লাহর কসম, তিনি খলীফার দরবারে গেলেন এবং ফিরে আসলেন—এর মাঝে এক ঢোক পানিও গলাধঃকরণ করেননি।

* * *

আল্লাহ তা'আলা 'আতা ইবনে আবী রাবাহকে একশত বছর দীর্ঘ এক জীবন দান করেছিলেন.....

যে জীবনকে তিনি পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন ইল্‌ম ও আমল দ্বারা.....

আলোকিত করেছিলেন নেক কাজ ও তাকওয়ার নূর দ্বারা......

পরিচ্ছন্ন করেছিলেন পার্থিব সম্পদের প্রতি নির্লোভ ও নির্মোহতার দ্বারা......

যখন তাঁর মৃত্যুর সময় হলো, দেখা গেলো তিনি পার্থিব আসবাবের বাহুল্য ও দুনিয়ার বোঝা থেকে ভারমুক্ত, হালকা।

দেখা গেলো পারলৌকিক সম্পদের হিসাবে তিনি বিপুল ধনবান–ঐশ্বর্যবান।

উপরন্তু তার অতিরিক্ত সঞ্চয়—

(ক) সত্তরটি হজ্জ....

(খ) সত্তরটি উকূফে আরাফাহ.....

আল্লাহর কাছে তিনি চেয়েছেন—তাঁর রেযামন্দী ও জান্নাত।

আল্লাহর কাছে তিনি পানাহ্ চেয়েছেন—তাঁর নারাজী ও জাহান্নাম থেকে।

* * *

[হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা দান করো,
মুসলিম জাতিকে তাঁর আদর্শ অনুসরণের ঐশ্বর্য দান করো।
প্রিয় পাঠক! দয়া করে বলো—"আমীন"]

‘আমের ইবনে ‘আবদুল্লাহ তামীমী (রঃ)

যুহদ ও সাধনা আট ব্যক্তির মাধ্যমে সমাপ্তিতে পৌঁছে, যাদের শীর্ষে রয়েছেন ‘আমের ইবনে ‘আবদুল্লাহ তামীমী।

—‘আলকামা ইবনে মুরসাদ

‘আমের ইবনে ‘আবদুল্লাহ (রঃ)

এখন আমরা হিজরী চতুর্দশ বর্ষে।

আমাদের সামনে বড় বড় সাহাবী ও তাবেঈনের কাফেলা, খলীফাতুল মুসলিমীন ‘উমর ইবনুল খাত্তাবের (রাঃ) নির্দেশে যারা বসরা শহরের সীমান্ত পরিদর্শন করছেন।

তাঁরা সংকল্প করেছেন—এই নতুন শহরে পারস্যের গাজী সৈনিকদের জন্য একটি সেনাছাউনী তৈরী করবেন।

গড়ে তুলবেন আল্লাহর পথে দাওয়াতের জন্য এক বাহিনী.....

নির্মাণ করবেন পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম সমুন্নত করার এক কেন্দ্র।

আর ঐ যে দেখা যায় দলে দলে মরু আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছুটে আসছেন মুসলিম জনতা, তারা আসছেন নবীন এই শহরটির দিকে।

আসছেন নজ্‌দ থেকে.....

হেজায থেকে.....

ইয়ামান থেকে.....

ঐসব অঞ্চল থেকে তারা এখানে সমবেত হচ্ছেন নবীন এই মুসলিম শহরের সীমান্ত রক্ষার জন্য।

সমাগত এই মুহাজির দলে ছিলেন নজদ থেকে আসা এক তামীম গোত্রীয় তরুণ, তাঁরই নাম ‘আমের ইবনে আবদুল্লাহ তামীমী আম্বরী।

* * *

সেদিন ‘আমের ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও নির্মল আত্মার অধিকারী এক পবিত্র যুবক।

নবগঠিত বসরা ছিলো সর্বাধিক ধনসম্পদ সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ একটি মুসলিম শহর। কেননা সেখানেই জমা হচ্ছিলো সকল গনীমত লব্ধ সম্পদ, সঞ্চিত হচ্ছিলো খাঁটি সোনার স্তূপ।

কিন্তু তামীমী তরুণ ‘আমের ইবনে আবদুল্লাহর আকর্ষণ ছিলো না মোটেও এসবের প্রতি।

মানুষের ধন–ঐশ্বর্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ত্যাগী, আল্লাহর সম্পদ–সওয়াবের প্রতি ছিলেন তিনি ভীষণ অনুরাগী।

দুনিয়া ও এর শোভার ব্যাপারে ছিলেন নিস্পৃহ, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের ব্যাপারেই ছিলো তাঁর সকল আগ্রহ।

* * *

সে সময় বসরার প্রধানতম ব্যক্তি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ)।

তিনি ছিলেন সমৃদ্ধ এই শহরের গভর্নর।

তিনিই ছিলেন এখান থেকে যে কোন গন্তব্যে চলমান সৈনিকদের প্রধান সেনাপতি।

তিনিই ছিলেন এই শহরের প্রধান ইমাম, প্রধান শিক্ষক এবং হিদায়াত ও দাওয়াতের একজন তৎপর মুর্শিদ।

তাবেঈ আমের ইবনে আবদুল্লাহ আঁকড়ে ধরলেন এই সাহাবীর আস্তিন। কী রণাঙ্গনে, কী রণাঙ্গনের বাইরে সবখানেই তিনি রইলেন এই মহান সাহাবীর নিত্যসঙ্গী ও খাদেম।

তিনি তাঁর সঙ্গী হলেন দেশে ও প্রবাসে।

এই সাহাবীর কাছেই তিনি লাভ করলেন পবিত্র কুরআনের নিখুঁত ও নির্ভুল শিক্ষা, কুরআনের জ্ঞানার্জন করলেন হুবহু সেই ভাবে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছিলো।

তাঁরই সূত্রে তিনি বর্ণনা করেছেন বিশুদ্ধ মারফূ' হাদীস।

তাঁরই কাছে অর্জন করেছেন দ্বীন ইসলামের সঠিক উপলব্ধি ও চেতনা।

জ্ঞানার্জনের ঈপ্সিত স্তর যখন তিনি অতিক্রম করলেন তখন নিজের জীবনকে ভাগ করে নিলেন তিন ভাগে—

এক ঃ কুরআনের জন্যে, এ সময়ে তিনি বসরার মসজিদে মসজিদে গিয়ে কুরআনের শিক্ষা দিতেন।

দুই ঃ নির্জন ইবাদতের জন্যে, এ সময়ে তিনি নিজের দু'পা নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

তিন ঃ জেহাদের জন্যে, এসময়ে তিনি খাপমুক্ত তরবারী নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতেন।

এই তিন উদ্দেশ্যের বাইরে তিনি জীবনের সামান্য সময়ও ব্যয় করেননি আর এ কারণেই তিনি আখ্যায়িত হয়েছিলেন "বসরার আবিদ ও যাহিদ" নামে।

* * *

বসরার জনৈক ব্যক্তি 'আমের ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে এরকম বর্ণনা করেন—

আমি একবার এক কাফেলার সঙ্গে সফর করছিলাম, 'আমের ইবনে আবদুল্লাহ ছিলেন সে কাফেলার একজন সঙ্গী। চলতে চলতে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো আমরা একটি ঝোঁপের নিকট পৌঁছে যাত্রা বিরতি করলাম।

আমের (রঃ) নিজের সামান একত্রিত করে ঘোড়াটিকে একটি গাছের সঙ্গে বাঁধলেন। ঘোড়ার রশি কিছুটা লম্বা রাখলেন। তার সামনে পরিমাণ মত ঘাস এনে দিয়ে প্রবেশ করলেন গভীর অরণ্যে। যেতে যেতে একসময় আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন। আমি সংকল্প করলাম—"তাঁর পিছু নেবো এবং দেখবো তিনি এত গভীর রাতে এই গহীন বনে করেন কী?"

দেখলাম—যেতে যেতে তিনি একটি ছোট্ট টিপির কাছে থামলেন, চতুর্দিক দিয়ে ঘন গাছপালায় ঘেরা এই নির্জন টিপিতে ঢুকে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অপলক দৃষ্টিতে সেই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এত পরিপূর্ণ, খুশু'খুযূ'পূর্ণ এবং এত চমৎকার নামায আমার জীবনে আর কখনো দেখিনি।

দীর্ঘ সময় ধরে নামায আদায়ের পর তিনি দু'আ করতে শুরু করলেন, দু'হাত তুলে বলতে লাগলেন—

"হে আল্লাহ! তুমিই আপন নির্দেশে আমাকে সৃষ্টি করেছো অতঃপর আপন ইচ্ছায় আমাকে দুনিয়ার নানান পরীক্ষায় ফেলে নির্দেশ দিয়েছো— "নিজেকে বাঁচাও।"

হে সর্বশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী! তুমি আপন দয়া ও অনুগ্রহে যদি আমাকে না বাঁচাও, তবে আমি কীভাবে নিজেকে বাঁচাবো? কীরূপে

আত্মরক্ষা করবো?

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তুমি জানো, যদি এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ আমার হাতে এসে যায় এবং তোমার নামে কেউ সেটা চাইতে আসে তবে তোমার সন্তুষ্টির আশায় আমি সবই দান করে দিবো।

সুতরাং তোমার সন্তুষ্টি আমাকে দান করো ইয়া আরহামার রাহিমীন!

হে আল্লাহ! আমি তোমাকে এমন হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসি যা সকল মুসিবতকে আমার জন্য সহজ করে দেয় এবং আমাকে সকল ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেয়।

তোমার ভালোবাসা পেলে আমি আর কোন পরোয়া করি না।

তোমার ভালোবাসা পেলে আমি আর ফিরেও দেখি না কিভাবে আমার সকাল গেলো আর কিভাবে আমার সন্ধ্যা এলো....."

* * *

বসরার লোকটি বলেন—

এই দৃশ্য দেখতে দেখতে একসময় আমি ভীষণ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

এরপর যতবার জেগেছি আমেরকে সেই একই স্থানে নামাযে অথবা মুনাজাতেই দেখেছি প্রভাতের আলো ফোটা পর্যন্ত।

ফজরের সময় হলে তিনি নামায পড়ে আবার দু'আ করতে লাগলেন। তিনি বললেন—

"ইয়া আল্লাহ! এই যে প্রভাতের আলো ফুটলো, মানুষ জীবিকার সন্ধানে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটে বেড়াবে.....

প্রতিটি মানুষেরই নানান প্রয়োজনীয়তা আছে.....অভাব আছে.....

কিন্তু 'আমেরের শুধু 'তোমার ক্ষমা' ছাড়া আর কোন অভাব নেই, প্রয়োজন নেই।

ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার এবং সব মানুষের সকল অভাব মিটিয়ে দাও ইয়া আকরামাল আকরামীন! (হে মহান দয়ালু)

* * *

ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তিনটি প্রার্থনা করেছিলাম, যার দুইটি তুমি কবুল করেছো আর একটিতে আমাকে বঞ্চিত করেছো, সেটা আমাকে দাওনি।

ইয়া আল্লাহ! দয়া করে সেটাও আমাকে দান করো, যেন আমি প্রাণভরে তোমার ইবাদত করতে পারি।"

এরপর তিনি উঠে পড়লেন তখন হঠাৎ আমার উপর তার চোখ পড়লে তিনি বুঝতে পারলেন রাতভর আমি তাকে অনুসরণ করেছি। ফলে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং আফসোস করে বললেন—

ঃ "মনে হচ্ছে রাতভর আমাকে পাহারা দিয়েছো? !"

ঃ "হাঁ, তা দিয়েছি।" —আমি জবাব দিলাম।

"রাতভর যা দেখেছো, দয়া করে সেগুলো গোপন রেখো, আল্লাহ তোমার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন।" —তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন।

আমি তখন বললাম ঃ

"আল্লাহর কসম! হয়ত আমাকে আপনার তিনটি প্রার্থনার কথা বলবেন, না হয় যা দেখেছি সেটা সব মানুষের কাছে বলে দেবো।"

তিনি বললেন—"দূর বোকা! এমন করো না।"

আমি বললাম—"তাহলে আমি যা বললাম তাই করুন....."

এভাবে বারবার আমার জিদ দেখে তিনি বললেন—

"ঠিক আছে, বলবো তবে তোমাকে আল্লাহর নামে কসম করে বলতে হবে যে, একথা তুমি কারো কাছে প্রকাশ করবে না।"

আমি বললাম—"আমি আল্লাহর নামে কসম করছি যতদিন আপনি বেঁচে থাকবেন ততদিন এই রহস্য প্রকাশ করবো না।"

তিনি বলতে শুরু করলেন—

"দ্বীনের ব্যাপারে নারীই ছিলো আমার কাছে সর্বাধিক ভয়ঙ্কর, ফলে আমি প্রার্থনা করেছিলাম যেন আল্লাহ আমার অন্তর থেকে তাদের ভালোবাসা দূর করে দেন। তিনি এই দু'আ কবুল করেছেন, ফলে এখন আমি একজন নারী এবং একটি দেয়ালের প্রতি দৃষ্টির মাঝে কোন পার্থক্য বুঝি না। এ দুটি আমার মনে কোন আলাদা অনুভূতি জন্মায় না।"

আমি বললাম—"এতো হলো একটি, দ্বিতীয়টি কি?"

তিনি বললেন—“আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম আমার অন্তরে যেন তিনি ছাড়া আর কারোর ভয় না থাকে, যেন আমি শুধুমাত্র তাঁকেই ভয় করি। এটাও তিনি কবুল করেছেন। এখন আসমান যমীনে তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিন্দুমাত্র ভয় পাইনা।”

ঃ “তৃতীয়টি কী?” —আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ “আমার ঘুম দূর করে দেয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যেন আমি রাতদিন প্রাণভরে তাঁর ইবাদত করতে পারি। আমার এই দু'আটি কবুল হয়নি।”

আমি তাঁর এই বিবরণ শুনে বললাম—

“নিজের শরীরের উপর একটু রহম করুন, আপনি তো রাতভর নামায আর দিনভর রোযা রাখছেন.....

যে আমল আপনি করছেন তার সামান্যতেই জান্নাত অবধারিত, আর যে ক্লেশ আপনি সহ্য করছেন তার সামান্যতেই জাহান্নাম থেকে মুক্তিও নিশ্চিত।”

ঃ “কিন্তু আমার ভয় হয় নাজানি কেয়ামতের ময়দানে আমাকে আল্লাহর সামনে লজ্জিত হতে হয়, যা তখন কোনই কাজে আসবে না!

আর এই ভয়েই আমি যখনই সুযোগ পাই ইবাদতের চেষ্টা করি।

আমি যদি নাজাত পেয়ে যাই, তবে সেটা হবে আল্লাহর অসীম রহমত।

আর যদি জাহান্নামের ফয়সালা হয় তবে সেটা হবে আমারই অবহেলা ও অলসতার ফল।”

* * *

‘আমের ইবনে আবদুল্লাহ যেমন ছিলেন ইবাদতগুযার তেমনি ছিলেন একজন ঘোড়সওয়ার মুজাহিদও।

যখনই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্র আহবান আসতো সেখানে তিনিই থাকতেন সর্বাগ্রে সাড়াদানকারী।

তিনি কোন রণাঙ্গনে শরীক হলে সর্বপ্রথম মুজাহিদদের মাঝে নিরীক্ষণ চালিয়ে কিছুলোক বাছাই করতেন এরপর তাদের ডেকে বলতেন—

ঃ "আমি তোমাদের সঙ্গী হতে চাই যদি আমার তিনটি শর্তে তোমরা রাজী থাকো....."

ঃ "কী শর্ত? !"

ঃ "এক—আমি তোমাদের খেদমত করবো, এ ব্যাপারে তোমরা কেউ আপত্তি করতে পারবে না।

দুই—আমিই সবসময় নামাযের আযান দিবো, অন্য কেউ আযান দেয়ার দাবী জানাতে পারবে না।

তিন—আমি সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের জন্য খরচ করবো, তোমরা কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

এগুলো সবাই একবাক্যে মেনে নিলে তিনি তাদেরকে বুকে জড়িয়ে নিতেন।

আর তাদের কোন একজনও যদি কোন একটি বিষয়ে আপত্তি করতো, তবে তাদেরকে তিনি বিদায়ী সালাম জানাতেন।

* * *

আমের (রঃ) ছিলেন সেই বিরল মুজাহিদদের একজন যারা রক্ত দেয়ার সময় হলে থাকেন সবার আগে আর গনীমত বন্টনের সময় সবার পিছে।

ফলে রণাঙ্গনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন এমন বিক্রমে যা আর কারো পক্ষেই সম্ভব হতো না।

গনীমত বন্টনকালেও তিনি দূরে সরে থাকতেন এমনভাবে যা সাধারণতঃ অন্য কেউ করেন না।

* * *

প্রাসঙ্গিক ঘটনা ঃ

সা'আদ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ)[১] কাদেসিয়া যুদ্ধ[২] শেষে পারস্য

---

[১] সা'আদ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ)—আশারায়ে মুবাশশারার (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের) একজন। কাদেসিয়া যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি।

[২] কাদেসিয়া—ইরাকের একটি বিখ্যাত অঞ্চল, ৬৩৭ খ্রীঃ সেখানে সংঘটিত যুদ্ধটিও

সম্রাট কেসরার রাজপ্রাসাদে অবতরণ করলেন।

তিনি 'উমর ইবনে মুকাররানকে নির্দেশ দিলেন সমস্ত গনীমতের মাল জমা করে হিসাব করতে। কেননা একপঞ্চমাংশ বাইতুল মালে পাঠিয়ে অবশিষ্ট মাল তিনি ভাগ করে দেবেন মুজাহিদদের মাঝে।

তাঁর সামনে জমা হলো বিভিন্ন প্রকার দামী ও উত্তম সম্পদ—যা বর্ণনার অতীত এবং গণনারও অতীত।

সঞ্চিত সম্পদরাশির মধ্যে আছে—সীসা দ্বারা সীল করা এক বিশাল ঝুড়ি, যাতে ঠাসা রয়েছে পারস্য সম্রাটদের সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্যের থালাবাসন।

আছে—উত্তম ও দামী কাঠের তৈরী অনেক বাক্স, যেগুলোতে ঠেসে ঠেসে রাখা হয়েছে কেসরাদের কাপড়-চোপড় এবং মণিমুক্তার প্রলেপ দেওয়া বহু বর্ম ও কণ্ঠহার।

আরো আছে—দুর্মূল্য আতর ও সুগন্ধির বেশ কয়েকটি বড় বড় বাক্স।

এছাড়াও রয়েছে—নারীদের সাজ-সরঞ্জাম, অলঙ্কার ইত্যাদির বিস্ময়কর সমাহার।

এখানে রয়েছে—পর্যায়ক্রমে পারস্য সম্রাটদের আলাদা আলাদা খাপবদ্ধ তরবারী।

রয়েছে সেই সব রাজা-বাদশা ও সেনাপতির তরবারী, যারা যুগে যুগে বশ্যতা মেনে নিয়েছে পারস্যের।

* * *

কর্মচারীরা যখন সকলের উপস্থিতিতে এইসব গনীমতের মাল হিসাব করছিলো তখন হঠাৎ সেখানে ভীষণ ওজনের বিশাল একটি বাক্স নিয়ে হাজির ধুলিমলিন বেশ ও এলোমেলো কেশধারী একলোক।

এই নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনী তৎকালীন সর্ববৃহৎ শক্তি পারস্যকে পরাজিত করে এক অবিশ্বাস্য বিজয় ও বিপুল গনীমত লাভ করেছিলো।—অনুবাদক

লোকটির বেশভূষায় সবাই ভাবলো—“এ আবার কোন্ আপদ এলো!”

কিন্তু এই তাচ্ছিল্যভরা দৃষ্টি যখন লোকটির উপর থেকে সরে বাক্সটির উপর পড়লো তখন বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে তারা সবাই সোজা হয়ে বসলো। ভাবলো—“এত চমৎকার বাক্সতো জীবনে আর চোখে পড়েনি! এমনকি এখানে এই যে বিপুল গনীমত কিন্তু এসবের কোন একটিও কি এর মত কিংবা অন্তত এর কাছাকাছি হবার যোগ্য? !”

এরপর যখন বাক্সটির ভেতরে তাদের চোখ পড়লো তখন তো তাদের বাকরুদ্ধ হবার যোগাড়, কারণ চমৎকার সেই বাক্সটি ছিলো দুষ্প্রাপ্য সব মাণিক্য ও মুক্তা দিয়ে ভরা .....

ফলে তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টির শিকার সেই এলোকেশ ও মলিন বেশধারীই সকলের নতুন এক ধরনের দৃষ্টির শিকার হলো, যার বাঙময় প্রকাশ ধ্বনিত হলো কারো কারো কণ্ঠে—

ঃ “কিন্তু তুমি পেলে কোথায় এই অমূল্য সম্পদের খনি? !”—তাদের সুরে ফুটে উঠলো অসম্ভব বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার তীব্র প্রকাশ।

ঃ “অমুক যুদ্ধে—অমুক স্থানে গনীমত পেয়েছি....।” লোকটির গায়ে না মাখা উত্তর।

ঃ “তুমি কিছু সরিয়ে রাখনি তো?”

ঃ “আল্লাহ তোমাদের ভ্রান্তি দূর করুন......

এই বাক্স এবং পারস্যের যাবতীয় সম্পদ আমার কাছে কর্তিত নখের বরাবরও তো নয়.....

এতে যদি শুধু বাইতুল মালের হক জড়িত না থাকতো তবে আল্লাহর কসম আমি ‘ওটা’ ছুঁয়েও দেখতাম না।

আমি নিতে চাইলে “কিছু” কেন পুরোটাই সরিয়ে রাখলে তোমরা জানতে কীভাবে?

আমি সরাতে চাইলে কেন এত কষ্ট করে ওটা এখানে টেনে আনবো?”

ঃ “কে তুমি হে মহান ব্যক্তি? কী তোমার নাম?”—রাজ্যের শ্রদ্ধা ও সমীহ এসে ভর করলো এবার তাদের কণ্ঠে।

ঃ "না—না, সেটা তোমাদের জানার দরকার নেই।

আমার নাম ধরে তোমরা প্রশংসা করবে? অন্যদের কাছে আমার সুনাম ও খ্যাতি ছড়াবে? আমাকে ফুলাবে?

আল্লাহর কসম আমি তা চাইনা, আমি সেটা হতে দেবোনা।

আমি শুধু মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছেই এর বিনিময় চাচ্ছি।"

এ কথাগুলো বলেই তিনি সেখান থেকে সরে পড়লেন।

লোকটির নাম ধাম জানার জন্য তারা নিজেদের একজন লোককে তাঁর পিছে পিছে পাঠালো।

অনুসরণকারী লোকটি মলিন বেশধারীর অজ্ঞাতসারে তাঁর পিছে পিছে যেতে লাগলো।

তিনি স্বগোত্রীয়দের মাঝে পৌঁছে সালাম কালাম করছিলেন, অনুসরণকারী দূর থেকে তাঁকে দেখিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলো—

ঃ "আচ্ছা ঐ লোকটি কে?"

ঃ "আশ্চর্য! তুমি তাঁকে চেনোনা!"

তিনিই তো বসরার বিখ্যাত আবিদ ও যাহিদ আমের ইবনে আবদুল্লাহ তামীমী (রঃ)।

* * *

এত কিছু সত্ত্বেও 'আমের ইবনে আবদুল্লাহ্র জীবন নির্ঝঞ্ঝাট ছিলো না, ছিলো না মানুষের নির্যাতনমুক্ত।

সত্য প্রকাশ ও অন্যায় প্রতিরোধ নামের আড়ালে একদল লোক তাঁর বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠেছিলো।

প্রত্যক্ষভাবে যে ঘটনার কারণে তিনি নির্যাতিত হয়েছিলেন, সেটা ছিলো এরূপ—

বসরার এক পুলিশ ঘাড় ধরে এক যিম্মীকে[১] টেনে নিয়ে যাচ্ছে.....

---

[১] যিম্মী—মুসলিম রাষ্ট্রের করদাতা অমুসলিম নাগরিক, যেমন ইহুদী, খ্রীষ্টান.......

যিম্মী সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে....

ঃ "বাঁচাও..... বাঁচাও......"

হে মুসলিম সমাজ ! তোমাদের নবীর আশ্রিতকে বাঁচাও....."

চিৎকার শুনে হযরত আমের এগিয়ে এলেন এবং যিম্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন

ঃ "তোমার কি কর বাকী পড়েছে?"

ঃ "জ্বি না হুজুর ! একদম হাল পর্যন্ত শোধ করা আছে।"

এবার পুলিশকে জিজ্ঞাসা করলেন

ঃ "কী চাও এর কাছে?"

ঃ "আমি একে বলেছি আমার সঙ্গে যেতে হবে ; দারোগার বাগান সাফ করতে হবে।"

ঃ "তুমি কি এতে রাজী?"—তিনি আবার যিম্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ "কক্ষনো না....."

এতে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি, তাছাড়া এই কাজের পর আমার উপার্জনের সময় থাকে না......

আমের (রঃ) গম্ভীর স্বরে পুলিশকে বললেন

ঃ "ওকে ছেড়ে দাও বলছি....."

ঃ "ছাড়বো না"—পুলিশের ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব।

আর এক মুহূর্তেরও বিলম্ব সহ্য হলো না আমেরের (রঃ) ; গায়ের চাদর খুলে তিনি গর্জে উঠলেন—

ঃ "আল্লাহর কসম ! আমার শরীরে এক ফোটা রক্ত থাকতেও মুহাম্মদ (সাঃ)এর অঙ্গীকার ভঙ্গ হতে দেবো না।"

হৈচৈ শুনে সেখানে জমে গেলো বাহু মানুষ, ঘটনা শোনার পর সবাই পুলিশের উপর ক্ষিপ্ত হলো এবং জোরপূর্বক তার হাত থেকে যিম্মীকে মুক্ত করলো।

এতে পুলিশ বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে চক্রান্ত করে আমেরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ চাপালো। তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মিথ্যা অপবাদ খাড়া করলো—

* তিনি আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পরিপন্থী।
* তিনি বিবাহের সুন্নাতকে অস্বীকার করেন।
* কোন প্রাণীর দুধ ও গোস্ত খান না। হালাল মনে করেন না।
* ক্ষমতাসীনদের কাছে যান না। অহঙ্কারী।

এসব কথা শেষ পর্যন্ত আমীরুল মুমিনীন 'উসমান (রাঃ)এর দরবারে উত্থাপিত হলো।

* * *

খলীফা বসরার গভর্নরকে নির্দেশ পাঠালেন আমের ইবনে আবদুল্লাহকে ডেকে অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে সর্বশেষ ফলাফল তাঁকে জানাতে।

গভর্নর তাঁকে ডেকে খলীফার নির্দেশের কথা শোনালে আমের বললেন

ঃ "আপনি আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ পালন করুন, জিজ্ঞাসা করুন।"

গভর্নর জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ "আপনি কি বিবাহের সুন্নাতকে অস্বীকার করেন?"

তিনি জবাব দিলেন—

ঃ" মোটেও না। বিবাহের সুন্নতকে আমি কখনোই অস্বীকার করি না।

আমি জানি—ইসলামে সন্ন্যাস যাপনের সুযোগ নেই, তথাপিও আমি বিবাহ করিনি, তার কারণ—আমি এমনই দুর্বল ও অসহায় একজন মানুষ যার আশঙ্কা রয়েছে—আল্লাহর জন্য সম্পূর্ণ সমর্পিত হৃদয়টি হয়তো স্ত্রীর কাছে পরাজিত হয়ে যাবে।"

ঃ "আপনি গোস্ত খান না কেন?"

ঃ "না পেলে খাবো কিভাবে? খেতে ইচ্ছা করলে এবং তখন পেয়ে গেলে ঠিকই খাই।"

ঃ "পনীর কেন খান না?"

ঃ "কারণ আমার এলাকায় পনীর তৈরী করে অগ্নিপূজকেরা, যাদের

কাছে ছাগলের জবাই করা এবং মরার মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। ফলে কোন্ পনীর হালাল আর কোন্‌টি হারাম তা নির্ণয় করতে পারি না। তবে যদি দু'জন মুসলমান বলে যে, এটা জবাই করা[1] ছাগলের তৈরী পনীর, তখন আমি পনীর খেতে মোটেও দ্বিধা করি না।"

ঃ "আমীর উমারাদের মজলিসে যান না কেন?"

ঃ "তোমাদের দুয়ারের প্রার্থী তো অনেক আছে ; তাদেরকে ডেকে ডেকে কাছে বসাও.....

তাদের অভাব অভিযোগগুলো মিটিয়ে দাও....

তোমাদের দুয়ারে যার কোন প্রার্থনা নেই, তাকে তার আপন্ পথে চলতে দাও।"

আমীরুল মুমিনীন উসমান (রাঃ)এর দরবারে এই খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পৌঁছানো হলো, কিন্তু তার মধ্যে কোন রাষ্ট্রদ্রোহিতার চিহ্ন তিনি খুঁজে পেলেন না। পেলেন না আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পরিপন্থী হওয়ার কোন প্রমাণও।

তবে এও সত্য যে তার বক্তব্যে বিশৃঙ্খলার আগুন নিভলো না....

বরং নানান কথার ফানুস তাঁকে ঘিরে বাতাসে উড়তে লাগলো।

ক্রমেই তাঁর সমর্থক ও বিরোধীদের মাঝে ভয়াবহ ফেৎনা ধুমায়িত হতে লাগলো।

ফলে উসমান (রাঃ) তাঁকে সিরিয়ায় প্রত্যাবাসনের (প্রস্থানের) নির্দেশ দিলেন......

সিরিয়ার গভর্নর মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানকে নির্দেশ পাঠালেন—

ভালোভাবে তাঁর ইস্তেকবাল করতে এবং তাঁর মর্যাদার প্রতি যত্নবান হতে।

* * *

[1] ছাগলের ছোট বাচ্চার পেট থেকে একটি অংশ দুধের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হতো, এরপর সেই দুধ পনীর হয়ে যেতো। এটাই ছিলো তখন পনীর তৈরীর পদ্ধতি।

যেদিন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বের হলেন সেদিন তাঁকে বিদায় জানাতে তাঁর ভাই–বন্ধু, ছাত্র ও ভক্তের এক বিরাট দল বসরার পথে নেমে আসলো।

তারা শহর ছেড়ে মারবাদ অঞ্চলে পৌঁছলে তিনি সকল ভক্তকে বললেন

ঃ "এখন আমি দুআ করবো, আপনারা 'আমীন' বলুন......"

একথা শুনে সকলের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলো, ঘাড় উঁচু করে সবাই শেষ বারের মত তাঁকে দেখতে লাগলো।

তিনি দু'হাত তুলে মুনাজাত করতে লাগলেন—

"ইয়া আল্লাহ! যে সব লোক আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছে, অন্যায়ভাবে আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, যারা আমাকে মাতৃভূমি থেকে বহিস্কারের জন্য দায়ী এবং যারা আমার ও আমার পরম বন্ধু স্বজনদের মাঝে বিচ্ছেদের জন্য দায়ী......

ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহ! আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, দয়া করে তুমিও তাদের ক্ষমা করে দাও.....

ইয়া আল্লাহ! তুমি তাদের দ্বীন ও দুনিয়াকে সুন্দর করে দাও.....

তুমি আমাকে, তাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানকে তোমার রহমত, ক্ষমা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছন্ন করে দাও, ইয়া আরহামার রাহিমীন!"

এরপর তিনি বাহনের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন সিরিয়ার দিকে, অতঃপর সম্পূর্ণ নতুন এই গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেলেন.....

* * *

হযরত আমের ইবনে আবদুল্লাহ জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়েছেন সিরিয়াতেই। সেখানে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসকে গ্রহণ করেছিলেন আপন আবাস হিসাবে। সেখানে তিনি আমীর মুআবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানের প্রচেষ্টায় লাভ করেছিলেন উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা।

এরপর যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত, ভক্তবৃন্দ খবর পেয়ে তাঁর

কাছে সমবেত হলেন, তারা দেখতে পেলেন—তিনি অঝোরে কাঁদছেন।

ঃ "বৃথাই কেন অশ্রু ঝরাচ্ছেন, আপনি ছিলেন বসরার আবিদ ও যাহিদ....."

তিনি বললেন—

"আল্লাহর কসম! আমি দুনিয়ার লোভে অথবা মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না, আমার ভয় শুধু এতটুকুই যে, হায়! আখেরাতের সফর কতই না দীর্ঘ, আর আমার পাথেয় কতই না স্বল্প!

আমি পৌঁছে গেছি জীবনের শেষ সন্ধ্যায়, আমি এখন ভয়ঙ্কর এক উত্থান পতনের মাঝে অনিশ্চিত গন্তব্যের দোলায় দোদুল্যমান।

হয়তো জান্নাত....... নয় তো জাহান্নাম......

আমি জানি না কোন্‌টি আমার চূড়ান্ত মন্‌যিল...."

অতঃপর তিনি জীবনের শেষ কয়েকটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, তখন তাঁর জিহ্বা ছিলো আল্লাহর যিকিরে সিক্ত.....

ঐখানে.....

ঐ প্রথম কেবলার[১] পবিত্র মাটিতে.....

তৃতীয় হারামের[২] পুণ্য ভূমিতে.....

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মে'রাজ গমনের স্থানে.....

চির নিদ্রায় শায়িত আছেন আমের ইবনে আবদুল্লাহ তামীমী.....

* * *

আল্লাহ তাআলা আমের (রঃ)এর জন্য তাঁর কবরকে আলোকিত করুন.....

চিরস্থায়ী জান্নাতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল করুন.....

---

[১] প্রথম কেবলা ঃ বাইতুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। কা'বাকে কেবলা বানানোর পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাস ছিলো মুসলমানদের প্রথম কিবলা।

[২] তৃতীয় হারাম ঃ হারাম অর্থ পুণ্য ভূমি, ১ম হারাম—মক্কা, ২য় হারাম—মদীনা, ৩য় হারাম—বাইতুল মুকাদ্দাস।

‘উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর (রঃ)

যদি কেউ জান্নাতী মানুষ দেখে সুখ পেতে চায়, সে যেন ‘উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইরকে তাকিয়ে দেখে।

—আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান

'উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর (রঃ)

পড়ন্ত বিকালের অস্তগামী সূর্য বাইতুল্লাহর উপর সোনালী রেখা বিস্তার করতে শুরু করলো, এতে বাইতুল্লাহর উন্মুক্ত ও পবিত্র প্রাঙ্গণে শীতলবায়ু প্রবাহের আভাস পেয়ে জীবিত সাহাবী ও বড় বড় তাবেঈদের অনেকেই তওয়াফ শুরু করে দিলেন, তাঁরা হেরেমের বায়ুমণ্ডলকে সুবাসিত করে দিলেন তাকবীর ও তাহলীল দ্বারা, পুণ্যভূমির পরিবেশকে সুরভিত করে দিলেন উত্তম উত্তম দু'আর দ্বারা।

সারাদিনের প্রখর উত্তাপে তেতে উঠা কা'বা অঙ্গনের ভাপ কমে যাওয়ায় এখন অন্যরাও দলে দলে হালকাবন্দী হয়ে পবিত্র কা'বার আশপাশে বসে পড়লো। এই ঘরের মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্য বুকে নিয়ে তারা আসন করে নিলো বিভিন্ন স্থানে।

তারা বাইতুল্লাহর অপরূপ সৌন্দর্যমাখা দীপ্তি চোখভরে উপভোগ করছিলো। তারা পরস্পরের মাঝে চালাচ্ছিলো বিভিন্ন আলোচনা পর্যালোচনা, যার মাঝে কোন গুনাহ ছিলো না, ছিলো না কোন অর্থহীন কথা।

কা'বা শরীফের অন্যতম খুঁটি রুকনে ইয়ামানীর কাছে বসেছিলো সুবাসিত পোশাক পরা ও উচ্চ বংশীয় চার তরুণ। উজ্জ্বল চেহারার এই চার তরুণের পোশাকের মিল আর হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতা দেখে মনে হচ্ছিলো—ওরা যেন এই মসজিদে উড়ে বেড়ানো কতগুলো পায়রা।

সেই চারজনের নাম আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, মুস'আব ইবনে যুবাইর, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর এবং আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান।

পুণ্যপথের যাত্রী সেই চার তরুণের মাঝে আলোচনা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো, তাদের একজন হঠাৎ প্রস্তাব করে বসলো—

ঃ চলো আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই.....

এভাবে তাদের নিষ্পাপ কল্পনাগুলো অদৃশ্যের বিশাল ভুবনে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগলো, তাদের স্বপ্নগুলো আকাঙ্খার সবুজ উদ্যানে পাখা মেলে ভাসতে লাগলো।

আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর বললেন—

ঃ "আমার আকাঙ্খা হলো হিজাযের কর্তৃত্ব লাভ করা, খেলাফতের গৌরব অর্জন করা....."

তার সহোদর মুস'আব বললেন—

ঃ "কিন্তু আমার আকাঙ্খা—দুই ইরাকের (কুফা ও বসরার) শাসক হওয়া, আমি চাই এ দুই অঞ্চলে যেন আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বি জন্ম নিতে না পারে।"

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বললেন—

ঃ "ঠিক আছে, তোমাদের আকাঙ্খাগুলো যথার্থ, তবে আমি কিন্তু সমগ্র অঞ্চলের খলীফা না হওয়া পর্যন্ত থামবো না....."

"মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানের পর খেলাফতের মসনদ আমিই লাভ করতে চাই....."

'উরওয়াহ ইবনে যুবাইর নীরব হয়ে রইলেন ; কিছুই বললেন না, ফলে সবাই তাঁর দিকে তাকালো—

ঃ "হে 'উরওয়াহ ! তোমার আকাঙ্খার কথা তো কিছুই বললে না?"

তিনি বললেন—

ঃ "তোমাদের পার্থিব আকাঙ্খায় আল্লাহ্ বরকত দান করুন, কিন্তু আমার আকাঙ্খা ভিন্ন রকম, আমি এমন একজন আমলদার আলেম হতে চাই, যার নিকট থেকে মানুষ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ গ্রহণ করবে, দ্বীনের আহকাম শিখবে....."

আমার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো—

"আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত প্রাপ্তির মাধ্যমে আখিরাতের জীবনকে সফলকাম করা....."

* * *

এরপর সময়ের চাকা ঘুরতে থাকে, একসময় ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়ার পর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর খলীফা নির্বাচিত হন।

আবার কা'বা শরীফের পাশেই—যেখানে বসে তিনি খলীফা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার অদূরেই একদিন নিহতও হন.....

এরপর মুস'আব ইবনে যুবাইর একদিন নিহত ভাই আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে ইরাকের শাসক নিযুক্ত হন এবং শাসন প্রতিরক্ষায় তিনিও শেষ পর্যন্ত আততায়ীর হাতে নিহত হন......

এরপর আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের পালা, নিজ পিতার মৃত্যুর পর তিনি হলেন খিলাফতের সর্বোচ্চ মর্যাদার উত্তরাধিকারী। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর এবং মুস'আব ইবনে যুবাইয়ের নিহত হওয়ার পর তার পক্ষেই সকল মুসলমানের সম্মিলিত সমর্থন ব্যক্ত হয়, তারই পক্ষে সর্বস্তরের মানুষের বাই'আত গৃহীত হয়।

এভাবে তিনি হয়ে উঠেন বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ সম্রাট। তখনকার পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাদশা।

কিন্তু সেই স্বপ্ন ও কল্পনার চতুর্থ সঙ্গী 'উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের কি হলো?

এসো আমরা তাঁর কাহিনী শুরু করি একেবারে গোড়া থেকে।

* * *

'উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের জন্ম হয় হযরত উমর ফারুক (রাঃ)এর খেলাফতকাল শেষ হওয়ার এক বছর পূর্বে। তাঁর পরিবার ছিলো সম্মান ও মর্যাদার বিচারে তৎকালীন পৃথিবীর সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাঁর পিতা ছিলেন যুবাইর ইবনে আওয়াম, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'হাওয়ারী' বা বিশেষ সহচর, যিনি ছিলেন ইসলামের সর্বপ্রথম তরবারী কোষমুক্তকারী, সর্বপরি যিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের এক ভাগ্যবান অংশীদার।

তাঁর মাতা ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর কন্যা আসমা, যার ডাকনাম দেওয়া হয়েছিলো যাতুন্নেতাকাইন বা দুই বেল্টওয়ালী[১]।

তাঁর নানা ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[১] এই নাম দেওয়ার কারণ, তিনি হিজরতের দিন নিজের কোমরবন্ধনী দুই টুকরো করে একটিতে বেঁধেছিলেন রাসূলের খাদ্যরসদ আর অন্যটিতে রাসূলেরই পানপাত্র।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম খলীফা এবং হিজরতের সময় তাঁর পর্বত গুহার অকৃত্রিম সঙ্গী ও জানবাজ বন্ধু।

তাঁর দাদী ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু হযরত সফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব। খালা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রাঃ)।

এমন কি দাফনকালেও হযরত আইশা (রাঃ)এর কবরে অবতরণকারী তিনিই। তিনিই নিজের দুই হাতে উম্মুল মুমিনীনের কবরের মাটি সমান করেছিলেন।

প্রিয় পাঠক !

তোমার কি মনে হয় এর চেয়েও সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশ হতে পারে?

ঈমান ও ইসলাম ছাড়া কি এর চেয়েও বড় সৌভাগ্য হতে পারে?

* * *

পবিত্র কা'বা অঙ্গনে 'উরওয়াহ একজন সত্যিকার আলেম হওয়ার যে আকাঙ্খা পেশ করেছিলেন তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি রাসূল (সাঃ)এর বেঁচে থাকা অবশিষ্ট সাহাবীদেরকে গনীমত মনে করতেন।

তিনি সবকিছু পেছনে ফেলে রেখে সেই সাহাবীদের গৃহে ছুটে যেতেন, তাঁদের পিছে নামায আদায় করতেন, তাঁদের মজলিসেই পড়ে থাকতেন, ফলে তিনি হাদীস শিখেছেন ও বর্ণনা করেছেন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব থেকে, আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ, যায়েদ ইবনে সাবেত, আবু আইয়ূব আনসারী, উসামা ইবনে যায়েদ, সাঈদ ইবনে যায়েদ, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, নু'মান ইবনে বশীর প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুম থেকে......

তিনি সর্বাধিক হাদীস শিখেছিলেন স্বীয় খালা উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রাঃ) থেকে, এভাবেই তিনি শেষ পর্যন্ত মদীনার সেই বিখ্যাত সাতজন ফকীহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, দ্বীনি বিষয়গুলোতে মুসলিম জাতি যাদের শরণাপন্ন হতেন বারবার।

এমন কি সৎ ও নেক শাসকবর্গও দায়িত্ব পালনে সাহায্য কামনা করতেন তাদেরই।

এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিকের আঞ্চলিক প্রশাসক হিসাবে মদীনায় এলেন। তখন বহু মানুষ তাঁর কাছে সমবেত হলো এবং তাঁর সঙ্গে সালাম বিনিময় করলো।

জোহরের নামায আদায়ের পর তিনি মদীনার দশজন ফকীহ্কে আমন্ত্রণ জানালেন, যাদের শীর্ষে ছিলেন 'উরওয়াহ ইবনে যুবাইর.....

আমন্ত্রিত ফুকাহায়ে কেরাম হাজির হলে তিনি নিজেই সবাইকে স্বাগত জানালেন, স্ব সম্মানে তাদেরকে বসতে দিলেন।

এরপর তিনি আল্লাহ তাআলার যথাসাধ্য হামদ ও ছানা (গুণগান) আদায়ের পর বললেন—

"আমি আপনাদেরকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যার ফলে আপনারা হবেন আমার ন্যায় ও ইনসাফের সহযোগী এবং লাভ করবেন অশেষ নেকী।

আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আপনাদের মতামত ছাড়া কোন বিষয়ে আমি চূড়ান্ত ফয়সালা করবো না।

আপনারা যদি কাউকে অন্যের উপর জুলুম করতে দেখেন, অথবা কারো উপর আমার কোন কর্মচারীর জুলুমের খবর শুনতে পান, তাহলে আপনাদের কাছে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, দয়া করে সেটা আমাকে জানাবেন।"

'উরওয়াহ ইবনে যুবাইর একথা শুনে তাঁর জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন এবং হক ও হেদায়াতের উপর তাঁকে অবিচল রাখার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন।

* * *

'উরওয়াহ ইবনে যুবাইর ছিলেন ইল্ম ও আমলের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেযগারী ও যোহদের সর্বোচ্চ ধাপ তিনি অতিক্রম করেছিলেন, যার ফলে প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও তিনি বিরামহীন রোযা রাখতেন।

রাতভর ইবাদতে মশগুল থাকতেন....

আল্লাহর যিকিরে হামেশা জিহ্বা সচল রাখতেন....

এসব কিছু সত্ত্বেও কুরআনের তিলাওতেই তিনি ছিলেন সর্বাধিক অনুরাগী।

দিনের বেলা দেখে দেখে কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠ করা এরপর সেটুকুই রাতে আবার নফল নামাযে তেলাওয়াত করা ছিলো তার প্রতিদিনের রুটিন।

যৌবনের শুরু থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই আমল তিনি শুধুমাত্র একদিনের দুর্ঘটনা ছাড়া আর কখনোই ত্যাগ করেননি।

সে ঘটনাটি একটু পরে আসছে।

* * *

'উরওয়াহ ইবনে যুবাইর নামাযের মধ্যে খুঁজে পেতেন হৃদয়ের প্রশান্তি, চোখের শীতলতা। নামাযকেই তিনি মনে করতেন বেহেশতী সুখের নমুনা ফলে তিনি নামাযকে পরিপূর্ণ সুন্দর করার উদ্দেশ্যে নামাযের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করতেন এবং নামায চূড়ান্ত রূপে দীর্ঘ করতেন.....

তিনি একদিন দেখলেন এক লোক দ্রুত নামায পড়ছে, নামায শেষ হলে তিনি লোকটিকে কাছে ডেকে বললেন—

ঃ "বাবা! আল্লাহর কাছে কি তোমার কোনই প্রয়োজন নেই? !....

আল্লাহর কসম! আমি তো নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহর কাছে আমার সকল প্রয়োজনের কথা জানাই, এমনকি লবণের কথাটাও।"

* * *

'উরওয়াহ ইবনে যুবাইর রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহি ছিলেন এক উদার ও অকৃপণ দানবীর.....

মদীনায় ছিলো তাঁর সর্ববৃহৎ এক বাগান.....

যেখানে ছিলো সুমিষ্ট পানি, শীতল ছায়া আর সারি সারি খেজুরের গাছ....

তিনি বাগানটিকে শিশুদের ও উট, বকরীর নির্যাতন থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে চতুর্দিক থেকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখতেন। একবার খেজুর পাকার সময় এলো, গাছে গাছে টসটসে খেজুর মানুষের দৃষ্টিকে লুব্ধ করতে লাগলো। সেই সময় একদিন বাগানের বেশীর ভাগ বেড়া পড়ে গেলো। মানুষের আনাগোনার সকল বাধা উন্মুক্ত হয়ে গেলো।

ফলে লোকজন আসার পথে একবার, ফেরার পথে একবার সেখানে প্রবেশ করে ইচ্ছামত খেজুর খেতে লাগলো, এমন কি ইচ্ছামত খেজুর সঙ্গে নিয়েও যেতে লাগলো।

তিনি নিজের এই বাগানে যখনই প্রবেশ করতেন তখনই বারবার পড়তেন এই আয়াত—

وَلَوْ لَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ - لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না ; আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহর দেয়া ব্যতীত (কারো) কোন শক্তি নেই। —কাহাফ ঃ ৩৯

* * *

ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিকের শাসনামলে আল্লাহ তাআলা উরওয়াহ ইবনে যুবাইরকে এমন এক কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন, যেখানে একমাত্র সজীব ঈমান ও দৃঢ় ইয়াকীন ছাড়া কারো পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

খলীফা ওয়ালীদ একবার 'উরওয়াহ ইবনে যুবাইরকে আমন্ত্রণ জানালেন দামেস্কে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তিনি লাব্বাইক বললেন সে আমন্ত্রণে। বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যখন তিনি খলীফার কাছে পৌঁছলেন, তাঁর শুভাগমন উপলক্ষে খলীফা এক বর্ণাঢ্য সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করলেন। তিনি রাজকীয় অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের মাধ্যমে

মেহমানের চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন।

কিন্তু এরপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় বাতাস বইতে লাগলো জাহাজের প্রতিকূলে—

'উরওয়াহর ছেলে খলীফার আস্তাবলে গেলেন শ্রেষ্ঠ ঘোড়াগুলো দেখার জন্য আর সেখানেই তাকে এমন ভীষণভাবে আঘাত করে বসলো একটি ঘোড়া, যাতে তার জীবন প্রদীপ সঙ্গে সঙ্গেই নিভে গেলো।

ব্যথাতুর পিতা ছেলের সমাধির মাটি হাত থেকে ঝেড়ে ফেলার আগেই তাঁর এক পা আক্রান্ত হলো ভীষণ ক্যান্সারে।

তাঁর পায়ের নলা ফুলে গেলো, ব্যথা তীব্র হতে লাগলো এবং দ্রুত সে ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো।

খলীফা ব্যাকুল হয়ে আশপাশের সকল চিকিৎসককে তলব করলেন.....

তাদেরকে তিনি যেকোন মূল্যে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য উৎসাহিত করলেন.....

কিন্তু সকল চিকিৎসক একমত হয়ে বললেন—

ব্যথা সারা দেহে ছড়িয়ে তাঁকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়ার আগেই পা কেটে শরীর থেকে দ্রুত বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে, এছাড়া এখন আমাদের আর কোন উপায় নেই।

খলীফা নিরুপায় হয়ে অনুমতি দিলেন....

শল্য চিকিৎসক গোস্ত, হাড্ডি ও চামড়া কাটার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হলেন। তিনি উরওয়াহকে বললেন—

ঃ "আপনাকে সংজ্ঞাহীন করার জন্য এক ঢোক নেশাকর পানীয় পান করাতে চাই। তাতে আপনি যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারবেন।"

ঃ তিনি বললেন, "খবরদার... এমন করবেন না....."

"সুস্থতার জন্য আমি হারামের সাহায্য নিতে চাই না......."

চিকিৎসক বললেন—

ঃ "তাহলে আপনাকে অবশ করার ওষুধ নিতে হবে....."

উরওয়াহ বললেন—

ঃ "আমার শরীর থেকে একটি অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আর আমি

তার কোন কষ্ট অনুভব করবো না—এটা আমার পসন্দনীয় নয়। আমি এই কষ্টের উপযুক্ত প্রতিদান আল্লাহর কাছে পেতে চাই।”

চিকিৎসক যখন শুরু করতে যাবেন তখন একদল লোক সামনে এগিয়ে এলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ “এরা কারা? ! কেন এসেছে? !”

বলা হলো—

ঃ “আপনাকে ধরার জন্য এদের আনা হয়েছে, তীব্র ব্যথায় হঠাৎ আপনি যেন পা টান দিতে না পারেন, সেজন্যই এরা আপনাকে শক্ত করে ধরে রাখবে।”

তিনি বললেন—

ঃ “ওদেরকে বিদায় করে দাও.....”

“ওদের প্রয়োজন হবে না। আশা করি সেটা আমি যিকির ও তাসবীহ দ্বারা সেরে নেব....”

এরপর চিকিৎসক গোস্ত কাটতে লাগলেন, ছুরি যখন হাড্ডিতে গিয়ে ঠেকলো তখন করাত দিয়ে হাড্ডি চিরতে লাগলেন।

উরওয়াহ্‌র মুখে তখন শুনা যাচ্ছিলো—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

চিকিৎসক হাড্ডি চিরতেছিলেন আর উরওয়াহ তাকবীর ও তাহলীল (আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়ছিলেন।

এভাবেই তাকবীর ও তাহলীলের মধ্যে দিয়ে তাঁর পায়ের নলা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা হয়ে গেলো। তাঁকে বেহুঁশ করা হয়নি, অবশ করা হয়নি এমনকি ধরেও রাখা হয়নি।

এরপর লোহার বড় চামচে (হাতায়) তেল গরম করা হলো, রক্তের বেগ থামানো ও ক্ষত শুকানোর উদ্দেশ্যে তার মধ্যে (উরওয়াহর) পা ডুবানো হলো, এতে তিনি মূর্ছিত হয়ে দীর্ঘ সময় সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে রইলেন যাতে ঐ দিনের নির্ধারিত তেলাওয়াত ছুটে গেল......

এ দিনটিই ছিলো যৌবনের শুরু থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত একমাত্র ব্যতিক্রম, যাতে তিনি তেলাওয়াতের রুটিন রক্ষা করতে পারেন নি।

তিনি যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, কেটে ফেলা পা দেখতে চাইলে

উপস্থিত লোকেরা সেটা তার সামনে পেশ করলো...

তিনি সেটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলতে লাগলেন....

ঃ "আমি সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি যিনি তোমার মাধ্যমে আমাকে রাতের আঁধারে মসজিদে নিয়ে যেতেন। তিনি খুব ভালভাবে জানেন, আমি কখনো তোমার মাধ্যমে কোন হারাম কাজে হেঁটে যাইনি......"

এরপর তিনি মুস'আব ইবনে আউসের কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেন—

لَعَمْرُكَ مَا اَهْوَيْتُ كَفِّىْ لِرِيْبَةٍ - وَلاَ حَمَلَتْنِىْ نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِىْ
وَلاَقَادَنِىْ سَمْعِىْ وَلاَ بَصَرِىْ لَهَا - وَلاَ دَلَّنِىْ رَأْئِىْ عَلَيْهَا وَلاَ عَقْلِىْ
وَاَعْلَمُ اَنِّىْ لَمْ تُصِبْنِىْ مُصِيْبَةٌ - مِنَ الدَّهْرِ اِلاَّ قَدْ اَصَابَتْ فَتىً قَبْلِىْ

কসম ! আমার দু'হাত কোন অন্যায় স্পর্শ করেনি
আমার দুটি পা অশ্লীল কাজে আমাকে বহন করেনি,
আমার চক্ষু, কর্ণ, বিবেক–বুদ্ধি সে পথে টানেনি,
সংশয়–সন্দেহ, অন্যায়–অশ্লীল পথ আমি মাড়াইনি,
আমি জানি কালচক্রে কোন বিপদ আমার ঘাড়ে চাপেনি
আমার পূর্বে শুধু এক তরুণের বড় বিপদ হয়েছিলো।

* * *

খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিকের কাছে মহামান্য মেহমানের এই বিপদ অসহনীয় ঠেকতে লাগলো.....

পুত্র হারানোর শোকে তিনি মুহ্যমান, এরই মধ্যে আবার নিজের পা হারালেন। এ অবস্থায় মহামান্য মেহমানকে শোক প্রকাশের ও সান্ত্বনা প্রদানের এক কৌশল তিনি খুঁজছিলেন।

আকস্মিক আব্‌স গোত্রের একদল লোক এলো রাজপ্রাসাদে, যাদের মাঝে ছিলো এক অন্ধ ব্যক্তি। খলীফা ওয়ালীদ লোকটির কাছে

দৃষ্টিহীনতার কারণ জানতে চাইলে লোকটি বললো—

ঃ "আমীরুল মুমিনীন! আব্‌স গোত্রে আমার চেয়ে ধন, জন, সন্তান ইত্যাদিতে ঐশ্বর্যশালী লোক আর একটিও ছিলো না; আমিই ছিলাম তাদের মাঝে সর্বাধিক সম্পদশালী, ঈর্ষণীয় সুখ ও সৌভাগ্যের মালিক।

আমি পরিবারবর্গ ও সম্পদসহ আমার স্বজাতির লোকদের সঙ্গে এক উপত্যকায় বাস করতাম। হঠাৎ এক রাতে আমাদের দিকে তেড়ে আসলো এক সর্বগ্রাসী বন্যা। তেমন ভয়াবহ বন্যা ইতিপূর্বে আমরা আর কখনো দেখিনি....

যা আমার সকল সম্পদ, পরিবার, পরিজন ও সন্তানকে ভাসিয়ে নিলো.....

বন্যার সেই ভয়াবহ ঢল আমার জন্য একটি মাত্র উট ও এক ছোট্ট শিশু ছাড়া আর কিছুই রেখে গেলো না।

উটটি ছিলো খুবই দুষ্ট প্রকৃতির, সে আমার হাত থেকে ছুটে পালালো, আমি বাধ্য হয়ে কোলের ছোট্ট শিশুকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তার পিছে পিছে ছুটতে লাগলাম......

সামান্য কিছু দূর যেতেই শিশুটির চিৎকার আমার কানে এসে লাগলো......

তাকিয়ে দেখি একটি নেকড়ের মুখে আমার মা–হারা সন্তানের মাথা।

আমি এবার ঘুরে শিশুটির দিকে দৌড়ালাম, আমি সেখানে পৌঁছুতে পারলাম না, তার আগেই আমার একমাত্র মা'হারা সন্তানটিকে খেয়ে শেষ করলো নেকড়ে বাঘটি।

এবার আমি আবার জীবনের শেষ সম্বল উটটির পিছে দৌড়াতে লাগলাম। একসময় তার কাছে পৌঁছে গেলাম, তার লাগাম ধরতে গেলাম অমনি সে পা দিয়ে আমার মুখে সজোরে আঘাত করলো, আমি লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে, সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেলো, এই সুন্দর পৃথিবী আমার কাছে পুরোপুরিই আঁধার হয়ে এলো।

এভাবেই মাত্র একটি রাতের ব্যবধানে আমি হয়ে পড়লাম সন্তান ও সম্পদহীন, পরিবারহারা, সবশেষে দৃষ্টিশক্তিহীন.....

সবকথা শুনে খলীফা দারোয়ানকে নির্দেশ দিলেন—

"আমাদের মেহমান 'উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের কাছে লোকটিকে নিয়ে যাও এবং তাকে এর কাহিনী শোনাও যেন তিনি বুঝতে পারেন এই পৃথিবীতে তার চেয়েও বেশী বিপদগ্রস্ত মানুষ আছে।

* * *

'উরওয়াহ ইবনে যুবাইরকে যখন মদীনায় আনা হলো এবং তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, তিনি প্রথমেই তাদেরকে বলে দিলেন—

ঃ "খবরদার! তোমরা যা শুনছো ও দেখছো, তাতে ভীত হয়ো না। কারণ আল্লাহ তাআলা আমাকে চারটি ছেলে দান করেছেন যার মধ্য থেকে তিনি একটি ছেলে নিয়ে তিনটিকে আমার কাছে রেখে দিয়েছেন.....

সুতরাং তাঁর প্রশংসাই করতে হবে, আলহামদুলিল্লাহ....

তিনি আমাকে চারটি পার্শ্ব দিয়েছেন, যার থেকে তিনি একটি নিয়ে আমার কাছে তিনটি রেখে দিয়েছেন.....

সুতরাং এ ব্যাপারেও তারই প্রশংসা করতে হবে, আলহামদুলিল্লাহ....

আমি আল্লাহর কসম করে বলছি তিনি আমার থেকে নিয়েছেন সামান্য এবং রেখেছেন অনেক বেশী।

তিনি আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন মাত্র একবার কিন্তু সুস্থ রেখেছেন দীর্ঘকাল।

* * *

মদীনার লোকেরা যখন তাদের প্রিয় আলেম ও ইমাম 'উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের ফিরে আসার খবর পেলো, তখন তাঁর গৃহে মানুষের ঢল নামলো। তারা তাঁকে সমবেদনা জানাতে ও তাঁর প্রতি শোক প্রকাশ করতে সমবেত হলো....

সকলেই তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, শোক প্রকাশ করলেন, তবে ইবরাহীম

ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তালহার সান্ত্বনাবাণীই ছিলো সবচেয়ে উত্তম। তিনি বললেন—

ঃ 'হে আবু আবদুল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আপনার সমগ্র অংগ থেকে একটি অংগ এবং সকল সন্তানের মধ্য থেকে মাত্র একটি সন্তান আপনার পূর্বেই জান্নাতে পৌঁছে গেছে....

ইনশাআল্লাহ একক অংশের পিছে পিছে সমগ্রটাও একই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে....

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য আপনার সেই অসাধারণ জ্ঞান, ফিকাহ ও মতামতকে অবশিষ্ট রেখেছেন যার আমরা অভাবী এবং যার প্রয়োজনীয়তা আমাদের ফুরোয়নি......

উহার দ্বারা আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদেরকে উপকৃত করুন.....

আল্লাহই আপনার সওয়াবের মালিক, তিনিই আপনার উত্তম হিসাবের জামিন।"

* * *

'উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের সমগ্র জীবনটাই ছিলো মুসলমানদের জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা, সফলতার পথপ্রদর্শক এবং কল্যাণের আহবায়ক....

তিনি সর্বাধিক যত্নবান ছিলেন বিশেষতঃ নিজ সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আর ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের সন্তানদের প্রতি, সুতরাং তাদেরকে উপদেশ প্রদানের সামান্য সুযোগকেও তিনি গনীমত হিসাবে গ্রহণ করতেন। তিনি একটি মুহূর্তের জন্যও তাদের হিতাকাঙ্খার সুযোগকে অবহেলা করতেন না। তিনি সর্বদাই তাদের কল্যাণ কামনা করতেন।

তিনি নিজ সন্তানদিগকে ইল্‌ম শিক্ষার উপদেশ দিতেন, তাদেরকে উৎসাহিত করে বলতেন—

ঃ "বাবারা! তোমরা ইল্‌ম শিক্ষা কর এবং তার হক আদায় কর—

তোমরা আজ ছোট ও গুরুত্বহীন হলেও খুব শীঘ্রই আল্লাহ

তোমাদেরকে ইলমের মাধ্যমে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ করে দিবেন।"

তিনি আরো বলতেন—

ঃ "ছিঃ ছিঃ দুনিয়াতে মূর্খ দাঁতপড়া বুড়োর চেয়ে খারাপ কিছু কি আর আছে? !"

* * *

তিনি দান সদকাকে আল্লাহর জন্য হাদিয়া হিসাবে গণ্য করতেন। তিনি বলতেন—

ঃ "হে ছেলেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার প্রতিপালককে এমন কোন হাদিয়া না দেয়, যা সে কোন মর্যাদাবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দিতে লজ্জাবোধ করে....

কেননা আল্লাহ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান ও সেরা সম্ভ্রান্ত।"

* * *

তিনি সন্তানদেরকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে চাইতেন, তাদেরকে মানুষের গভীরে পৌঁছুতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন—

ঃ "হে ছেলেরা! তোমরা যখন কোন লোককে চমৎকার একটি কাজ করতে দেখবে, তখন তার প্রতি কল্যাণের চিন্তা করবে, যদিও সে মানুষের চোখে একজন খারাপ লোক। কেননা ঐ ব্যক্তি অনুরূপ চমৎকার কাজ নিশ্চয়ই আরো অনেক করে থাকে....

আর যখন কাউকে কোন কুৎসিত কাজ করতে দেখবে, তখন তার ব্যাপারে সাবধান থাকবে, যদিও সে মানুষের দৃষ্টিতে একজন ভাল মানুষ ; কেননা নিঃসন্দেহে অনুরূপ স্বভাব তার মাঝে আরো আছে।

মনে রেখো ভালো কাজ জানান দেয় আরো অনেক ভালোর কথা।

আর মন্দ কাজ বলে দেয় আরো অনেক মন্দের কথা....."

* * *

তিনি তাদেরকে সদাচরণের ও উত্তম কথা বলার নির্দেশ দিতেন, প্রফুল্ল চেহারায় মানুষের মুখোমুখী হতে বলতেন। তিনি বলতেন—

ঃ "হে ছেলেরা! হিকমত ও দর্শনে লিখিত আছে—'তোমার কথা সুন্দর করো, চেহারা হাস্যোজ্জ্বল করো, তাহলে তুমি হবে সর্বাধিক জনপ্রিয় মানুষ....'

* * *

তিনি যখন মানুষকে শৌখিনতা ও বিলাসিতার প্রতি ঝুঁকতে দেখতেন এবং দেখতেন সুখ ও সম্ভোগপূর্ণ জীবনকে পসন্দ করতে, তখন তিনি স্মরণ করিয়ে দিতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের দুঃখ-কষ্ট, তাঁর ত্যাগ ও কুরবানীর কাহিনী।

নবী জীবনের সেই সব অমর কাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো—মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

উরওয়াহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি আমার হাত ধরে বললেন—

ঃ "হে আবু আবদুল্লাহ!"

আমি বললাম—

ঃ "লাব্বাইক...."

তিনি বললেন—

ঃ "আমি আমার মা[১] আইশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, তিনি বললেন—

ঃ "হে ছেলে!"

আমি বললাম—

ঃ "লাব্বাইক...."

তিনি বললেন—

[১] মূলতঃ হযরত আইশা (রাঃ) ছিলেন তাঁর খালা, যা এই জীবনীর শুরুতেই উল্লেখ রয়েছে। খালাকে 'মা' বলা কোন অভিনব কিছু নয়—অনুবাদক।

ঃ "আল্লাহর কসম! আমরা একনাগারে চল্লিশ রাত পর্যন্ত এমনভাবে কাটিয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে আমরা আগুন দিয়ে না কোন বাতি জ্বালিয়েছি না অন্যকিছু..."

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

ঃ "হে আম্মা! আপনারা জীবন ধারণ করতেন কিভাবে?"

তিনি বললেন—

ঃ "দুই কালো বস্তু দিয়ে, খেজুর আর পানি।"

* * *

এরপর হযরত 'উরওয়াহ পূর্ণ একাত্তর বছর বেঁচেছিলেন ভালভাবে, কল্যাণে পূর্ণ, পর্যাপ্ত নেকীতে ভরা আর তাকওয়ার ভিত্তিতে গড়া ছিলো তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন....

মৃত্যুর চূড়ান্ত সময় যেদিন উপস্থিত হলো, সেদিনটিতেও তিনি ছিলেন রোযাদার...

তাঁর পরিবারের লোকেরা বহু জোরাজুরি করলেন তাঁর রোযা ভাঙ্গানোর জন্য, কিন্তু তিনি কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না....

আসলে তিনি রোযা ভাঙ্গতে অস্বীকার করেছেন, কারণ তিনি চাচ্ছিলেন, তাঁর ইফতার হবে হাউজে কাউসারের পানি দিয়ে....

রূপোর ঝকঝকে গ্লাসে.....

ডাগর চোখের হুরদের হাতে.....

* * *

রাবী' ইবনে খোসাইম (রঃ)

হে আবু ইয়াযিদ, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দেখতেন, তাহলে অবশ্যই তোমাকে ভালবাসতেন।

—সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)

রাবী' ইবনে খোসাইম (রঃ)

হেলাল ইবনে ইসাফ[১] তার মেহমান মুন্‌যির সাওরী[২]কে বললেন—

ঃ "হে মুনযির! তুমি কি আমার সঙ্গে শায়খের দরবারে যাবে, যেখানে আমরা কিছু সময় ঈমানী পরিবেশে কাটাতে পারবো?"

মুনযির বললেন—ঃ "অবশ্যই যাব......"

"আল্লাহর শপথ আমি তো শুধুমাত্র শায়খ রাবী' ইবনে খোসাইমের সঙ্গে সাক্ষাতের আকাঙ্খায় এবং তাঁর ঈমানের নূরে আলোকিত মজলিসে কিছুটা সময় কাটানোর আকর্ষণে এই কুফা নগরীতে ছুটে এসেছি। সুতরাং সেখানে তো যাবই।"

"কিন্তু তুমি কি আমাদের জন্য তাঁর অনুমতি নিয়েছ?"—মুনযির জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি শুনেছি তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হবার পর থেকেই আর কোথাও বের হন না, আপন গৃহে আপন প্রভুর ইবাদত বন্দেগীতে সময় কাটিয়ে দেন। কোন মানুষকে সাক্ষাত প্রদানে তিনি তেমন আগ্রহী নন।"

হেলাল (রঃ) বললেন—

ঃ "কুফার লোকেরা যতদিন ধরে তাঁকে জানে, তিনি তো আগাগোড়া এমনই ছিলেন, অসুখ তাঁর মধ্যে নতুন কোন পরিবর্তন আনেনি।"

মুনযির বললেন—

ঃ "তাহলে তো আমাদের যেতে কোন বাধা নেই।"

"তবে এই সব শায়খের বিভিন্ন হাল ও বিভিন্ন আদাত (অভ্যাস) থাকে। সুতরাং আমরা কি প্রশ্ন করে করে তাঁর কথা শুনবো নাকি চুপচাপ বসে তিনি যা বলেন তাই শুনতে থাকবো?"

"তাঁর দরবারের রীতি কোন্‌টা?"

হেলাল বললেন—

"তুমি কিছু জিজ্ঞাসা না করলে রাবী' ইবনে খোসাইম কিছুতেই মুখ

---

[১] হেলাল ইবনে ইসাফ আশজাঈ, তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য প্রথম শ্রেণীর তাবেঈ।

[২] মুনযির সাওরী, তিনি ছিলেন একজন পরবর্তী তাবেঈ।

খুলবেন না। কারণ যিকির ও ফিকির (চিন্তা) এ দুটোই তার কথা ও নীরবতা।

মুনযির বললেন—

ঃ "তাহলে চলুন আল্লাহর নামে রওনা দেই।"

তারা যখন সেখানে পৌঁছলেন উভয়ে তাঁকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ "কেমন আছেন?"

ঃ "শরীরে বল নেই, ইবাদত বন্দেগী করতে পারি না, শুধু শুয়ে বসে রিযিক ধ্বংস করছি...."

"মৃত্যুর সময় গুণছি...."

হেলাল (রঃ) বললেন—

"কুফা নগরীতে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক এসেছেন, আপনি অনুমতি দিলে তাকে একবার নিয়ে আসতে পারি।"

তিনি জবাব দিলেন—

ঃ "হেলাল! আমি জানি ওষুধের মধ্যে কার্যকারিতা আছে।

কিন্তু 'আদ, সামুদ, কূপবাসী এবং এদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায় কেন ধ্বংস হয়েছিলো?[১]

কত পার্থিব মোহ এবং পৃথিবীর ভোগ সামগ্রীর প্রতি তাদের কত আকাঙ্খাই না ছিলো!

শক্তি ও ক্ষমতায় আমাদের চেয়ে তারা কতই না কঠিনতর ছিলো....

তাদের মাঝেও নিশ্চয় অনেক চিকিৎসক ছিলো....

ছিলো অনেক রুগী.....

কিন্তু আল্লাহর আযাব থেকে না তাদের চিকিৎসক মুক্তি পেয়েছে, না পেয়েছে রুগী!!

আসল রোগ যদি এটাই হতো যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তাহলে আমি অবশ্যই তোমার ঐ ডাক্তারের চিকিৎসা নিতাম....."

---

১ তিনি সূরা ফুরকানের ৩৮নং আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যাতে রয়েছে—
"আমি ধ্বংস করেছি 'আদ, সামুদ, কূপবাসী এবং এদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে।"

ঃ "তাহলে আসল রোগ কোন্‌টি?"—মুনযির আদবের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ "আসল রোগ হলো গুনাহ্‌...."

ঃ "তার ওষুধ কি? !"

ঃ "একমাত্র ওষুধ—এস্তেগফার।"

ঃ "সুস্থ্ হওয়ার উপায় কি?"—মুনযিরের জিজ্ঞাসা।

ঃ ".....তওবা.... এমন তওবা যার পর আর গুনাহের পুনরাবৃত্তি হবে না...."

এরপর তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—

ঃ "গোপন গোনাহ্‌গুলোর ব্যাপারে সাবধান....."

সেগুলো মানুষের কাছে, যতই গোপনীয় হোক না কেন, আল্লাহর কাছে মোটেও গোপনীয় নয়।

সেগুলোর ওষুধ খোঁজ....."

মুনযির জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ "ওগুলোর ওষুধ কি?"

শায়খ বললেন—

ঃ "তাওবাতুন নাসূহা"[১]

এরপর তিনি এমনভাবে ক্রন্দন করতে লাগলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো।

মুনযির বললেন—

ঃ "এত ইবাদত ও পরহেযগারী সত্ত্বেও আপনি কাঁদছেন? !"

তিনি বললেন—".....হায় আমার পরহেযগারী! !"

আহা! আমাদের দেখা সেইসব মানুষকে যদি তোমরা দেখতে, যদি তাদের পরহেযগারীর খবর রাখতে! যাদের তুলনায় আমাদের পরহেযগারী চুরি, ডাকাতির সমতুল্য।" (তিনি সাহাবীদের প্রতি ইংগিত করেছেন)

হেলাল বলেন—

[১] তওবাতুন নাসূহা—এমন খাঁটি তওবা যাতে পুনরায় পাপাচার না করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত হয়।

এমনি মুহূর্তে আমাদের সামনে হাজির হলো শায়খের ছেলে, সে সালাম দিয়ে বললো—

ঃ "আব্বাজান! আম্মা কষ্ট করে আপনার জন্য বিশেষভাবে একটু মিষ্টান্ন তৈরী করেছেন। আপনার কখন ইচ্ছা হবে—সেটার জন্য আম্মা ভীষণ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন—এখন কি সেটা নিয়ে আসবো?"

তিনি বললেন—

ঃ "নিয়ে এসো।"

ছেলেটি মিষ্টান্ন আনতে গেলে তখনই এক ভিক্ষুক দরজায় আওয়াজ দিলো, শায়খ বললেন—"ওকে ভেতরে নিয়ে এসো।"

সে বাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করলো, আমি দেখলাম, ছিন্ন, ভিন্ন পোশাক পরা এক বৃদ্ধ, যার মুখ থেকে লালা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে—লোকটি অপ্রকৃতিস্থ, পাগল।

আমি চোখ ফিরিয়ে নেবার আগেই শায়খের ছেলে সেখানে প্রবেশ করলো মিষ্টির থালা নিয়ে শায়খ ইশারায় ভিক্ষুকের সামনে থালাটি রাখতে নির্দেশ দিলেন।

ভিক্ষুক থালাটির উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগলো। একটু একটু করে সবটুকু খেয়ে, মুখের লালায় থালাটি নোংরা করে রেখে সে চলে গেলো।

ছেলে আফসোস করে বলতে লাগলো—

"আব্বাজান! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আম্মার এত কষ্ট এবং আগ্রহ—সবকিছু উপেক্ষা করে আপনি মিষ্টিটুকু নিজে না খেয়ে এমন এক পাগলকে খাওয়ালেন যে বুঝতেও পারলো না—ওগুলো ছিলো কত দুর্লভ!"

শায়খ বললেন—

ঃ "বেটা! সে বুঝতে না পারলেও আল্লাহ কিন্তু বুঝতে পেরেছেন...."

এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন—

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

অর্থাৎ "কষ্মিনকালেও তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করো।"—আল ইমরান ঃ ৯২

এমনি সময় সেখানে প্রবেশ করলেন শায়খের জনৈক আত্মীয়।

তিনি বললেন—

"হে আবু ইয়াযিদ! হুসাইন ইবনে ফাতেমা (রাঃ) নিহত হয়েছেন।"

শায়খ শুনে বললেন—

"ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন...."

এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন—

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ -

অর্থ ঃ "বলুন হে আল্লাহ! সমস্ত আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতো।"—যুমার ঃ ৪৬

আত্মীয়টি এতে শান্ত হলো না, বরং আবারো জিজ্ঞাসা করলো—

ঃ "তাঁর হত্যার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?"

ঃ "আমার কথা হলো—আল্লাহর কাছেই তাদেরকে ফিরতে হবে এবং আল্লাহর কাছেই তাদের হিসাব দিতে হবে।"

হেলাল (রঃ) বলেন—

আমি দেখলাম—যোহরের সময় প্রায় হয়ে যাচ্ছে সুতরাং শায়খকে বললাম—"আমাকে কিছু উপদেশ দিন...."

তিনি বললেন—

ঃ "খবরদার হেলাল! মানুষের প্রশংসায় প্রতারিত হয়ো না।

কারণ, মানুষ তো শুধু বাহিরটুকুই জানে।

মনে রেখো অবশ্যই তোমাকে তোমার আমলের পরিণতি ভোগ করতে হবে। যে সব আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয়নি, সেগুলো খুঁজেই পাওয়া যাবে না, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

মুনযির বললেন—

"আমাকেও কিছু উপদেশ দিন, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন।"

শায়খ বললেন—

ঃ "হে মুনযির! তোমার জানা বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো....

যা তুমি জাননা সে ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হও।

হে মুনযির! (খাঁটি তওবার ইচ্ছা না থাকলে) তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এরকম না বলে—

হে আল্লাহ! আমি অতীতের গুনাহ ত্যাগ করে তোমার কাছে ফিরে আসছি, অতঃপর সত্যি যদি ফিরে না আসে তাহলে সেটা হবে মিথ্যা ওয়াদার শামিল।

বরং বলা উচিত হে আল্লাহ! আমার তওবা কবুল করো, তাহলে সেটা হবে দু'আর শামিল।

হে মুনযির! মনে রেখো দুনিয়াদারী কথায় কোন কল্যাণ নেই, কল্যাণ কেবল এই কথাগুলোতে—

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ.....

আল্লাহু আকবার.....

আলহামদুলিল্লাহ....

সুবহানাল্লাহ..... বলার মধ্যে।

এছাড়াও কল্যাণের প্রার্থনায়.....

অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনায়......

সৎকাজের আদেশে.....

অসৎকাজের নিষেধে.....

এবং কুরআন পাঠে, কল্যাণ রয়েছে।

এছাড়া আর কোন কথায় কোন কল্যাণ নেই।"

মুনযির বললেন—

ঃ "আমরা দীর্ঘসময় আপনার কাছে বসেও, আপনাকে কোন কবিতা বলতে শুনলাম না, অথচ আপনার কোন কোন সঙ্গীকে দেখেছি তারা কবিতা বলে দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন।"

তিনি বললেন—

ঃ "এখানে (দুনিয়ায়) যে কথাই বলবে সেটাই লিখিত হবে এবং সেখানে (পরকালে) তোমাকে পড়ে শোনানো হবে.....

আমি চাইনা, আমার আমলনামায় এমন কোন পংক্তি লিখা হোক

যা হিসাবের সময় আমার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত হবে।”

এরপর তিনি আমাদের সকলের দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন—

“তোমরা বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করবে, কেননা মৃত্যু আমাদের অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যু আমাদের অনিবার্য প্রতীক্ষা। অনিবার্য প্রতীক্ষিতের অনুপস্থিতি যতই দীর্ঘ হয় উপস্থিতি ততই ঘনিভূত হয়।”

এরপর তিনি এত ক্রন্দন করলেন যে, অশ্রুতে তাঁর চোয়াল ভিজে গেলো। অশ্রুভেজা কণ্ঠে বললেন—

ঃ “আগামীকাল (কেয়ামতের দিনে) আমাদের কি করার থাকবে?”

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا - وَ جَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا - وَ جِآءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ -

অর্থ ঃ “যখন পৃথিবী চূর্ণ–বিচূর্ণ হবে এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেস্তাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে।”—আল ফাজর ঃ ২১–২৩

হেলাল (রঃ) বলেন—

রাবী' ইবনে খোসাইমের কথা শেষ না হতেই যোহরের আযান হলো। তিনি ছেলের দিকে ফিরে বললেন—

“চলো আমরা আল্লাহর দাঈর (আহবানকারী) ডাকে সাড়া দেই...।”

ছেলে আমাদের সাহায্য চেয়ে বললো—

ঃ “দয়া করে একটু সাহায্য করুন, আব্বাজানকে মসজিদে নিতে হবে।”

আমি বাম দিকে আর ছেলে ডানদিকে ধরে তাঁকে উঠালাম, তিনি আমাদের দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে পৌছলেন....

তখন মুনযির তাঁকে বললেন—

ঃ “হে আবু ইয়াযিদ! আল্লাহ পাক আপনাকে অবকাশ দিয়েছেন, আপনি এত কষ্ট না করে, নিজের ঘরেই নামায পড়ে নিতে পারেন!!”

তিনি বললেন—

ঃ "ঠিকই বলেছো.....

কিন্তু আমি যে আহবান শুনলাম.....

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ -

(কল্যাণের দিকে এসো)

(কল্যাণের দিকে এসো)

কেউ যদি কল্যাণের ডাক শুনতে পায় সেকি আর ঘরে থাকতে পারে? তার তো হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সে ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত।"

* * *

কে ছিলেন এই রাবী' ইবনে খোসাইম?!

তিনি ছিলেন বিখ্যাত এক তাবেঈ....

প্রসিদ্ধ সেই আট ব্যক্তির অন্যতম যাদের প্রত্যেকের উপর আপন আপন যুগের যুহুদ ও ত্যাগের সমাপ্তি ঘটেছে।

তিনি ছিলেন আদি আরব বংশীয়....

তিনি ছিলেন (مضر) মুদার গোত্রীয়.....

তাঁর বংশ সূত্র মিলিত হয়েছে রাসূলের (সাঃ) পিতৃপুরুষ ইলিয়াস ও মুদার এর সঙ্গে।

মায়ের কোল থেকেই তাঁর বিকাশ ও বর্ধন ঘটেছে ইবাদত বন্দেগীর পরিবেশে....

তাঁর দুধ ছাড়ানো হয়েছে তাকওয়া ও পরহেযগারীর ভেতর দিয়ে....

* * *

তাঁর মা রাতে ঘুমিয়ে যেতেন অতঃপর ঘুম ভাঙ্গলেই বালক রাবী'কে আর বিছানায় পেতেন না, পেতেন জায়নামাযে.....

কখনো সে মুনাজাতের মধ্যে চোখের পানিতে ভাসছে....

আবার কখনো নামাযে আল্লাহর ধ্যানে হাবু ডুবু খাচ্ছে....

তিনি কোমল কণ্ঠে তাকে ডেকে বলতেন—

ঃ "বাবারে! তোমার চোখে কি একটুও ঘুম নেই? !"

তিনি জবাব দিতেন—

ঃ "যার শত্রুর ভয় আছে, তার চোখে কি আঁধার ছড়িয়ে পড়লে ঘুম থাকতে পারে? !"

একথা শুনে চোখের পানিতে বৃদ্ধার গাল ভেসে যেত, তিনি ছেলের জন্য দু'আ করতেন।

আরো পরে রাবী' (রঃ) যখন যুবক হলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যুবক হলো তাঁর পরহেযগারী এবং খোদাভীতি.....

রাতের আঁধারে যখন সব মানুষ নরম বিছানায় গা এলিয়ে দিতো তখন এই যুবকের কান্নাকাটি আর বিলাপ মায়ের কোমল মনকে অস্থির করে তুলতো। এমন কি তাঁর মনে নানারকমের ভালো-মন্দ সন্দেহের আনাগোনা হত....

সুতরাং তিনি তাকে ডেকে বলতেন—

ঃ "বাবা গো! তোমার কি হয়েছে বলো না? !"

"তুমি কি কোন অপরাধ করেছো....."

"তুমি কি কাউকে হত্যা করেছো....."

তিনি জবাব দিতেন—

ঃ "হাঁ, মা, আমি একটি প্রাণ হরণ করেছি...."

সরল মা আফসোসের সুরে জিজ্ঞাসা করেন—

ঃ "বাবা গো! তুমি বলো কে সেই নিহত ব্যক্তি, তার পরিবারের লোকজনকে বলে চেষ্টা করলে হয়ত তারা তোমাকে ক্ষমা করে দেবে?"

আল্লাহর কসম! নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তোমার কান্নাকাটি আর রাত্রি জাগরণের কথা শুনলে অবশ্যই তোমার উপর রহম করবে।"

তিনি বলেন—

ঃ "কাউকে বলো না মা, তার কোন প্রয়োজন নেই।

কারণ আমি হত্যা করেছি আমারই আত্মাকে....

তাকে হত্যা করেছি গুনাহের অস্ত্র দিয়ে....."

* * *

রাবী' ইবনে খোসাইম (রঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন 'স্বভাব চরিত্রে', 'আকৃতি–প্রকৃতিতে' রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সর্বাধিক নিকটতম সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর।

উস্তাযের খেদমতে তিনি এমনভাবে লেগে থাকতেন যেমন সন্তান তার মায়ের পিছে লেগে থাকে....

পক্ষান্তরে উস্তাযও শিষ্যকে এমন ভালবাসতেন যেমন পিতা বাসে তার একমাত্র সন্তানকে.....

রাবী' ইবনে খোসাইমের জন্য ইবনে মাসউদের গৃহে ছিলো সার্বক্ষণিক সাধারণ অনুমতি, তিনি যতক্ষণ উস্তাযের কাছে থাকতেন ততক্ষণ সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার থাকতো না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাবী' এর পরিচ্ছন্ন হৃদয়, নিস্কলুষ অন্তর ও ইখলাসপূর্ণ ইবাদত দেখে ভীষণ আফসোস করতেন।

তিনি ভেবে ব্যথিত হতেন রাবী' এর জীবন রাসূলের (সাঃ) যুগ থেকে বিলম্বিত এবং তাঁর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত বলে।

তিনি রাবী'কে বলতেন—

"হে আবু ইয়াযিদ! যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দেখতেন, তবে অবশ্যই তোমাকে খুব ভালবাসতেন।"

তিনি আরো বলতেন—

ঃ "আমি তোমাকে যতবারই দেখেছি ততবারই মনে পড়েছে বিনয়ী আর নিষ্ঠাবানদের কথা......"

* * *

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে মোটেও অতিরঞ্জিত কিছু বলেননি, কেননা রাবী' ইবনে খোসাইম তাকওয়া, পরহেযগারী ও খোদাভীতির এমন উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন, যেখানে তখনকার খুব অল্প লোকই পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর তাকওয়া, পরহেযগারী সম্পর্কে এমন এমন বক্তব্য বর্ণিত

হয়েছে যা নিয়ে ইতিহাসের সোনালী পাতা অনন্তকাল ধরে অহঙ্কার করবে।

তাঁর এক সঙ্গী বর্ণনা করেছেন—

ঃ "আমি কুড়ি বছর রাবী' ইবনে খোসাইমের সাহচর্যে কাটিয়েছি কিন্তু এত দীর্ঘ সময়েও কখনো তাঁকে উত্তম কথা ছাড়া আর কিছু বলতে শুনিনি।"

এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন—

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

অর্থ ঃ তারই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়। —ফাতের ঃ ১০

তাঁর সম্পর্কে আবদুর রহমান ইবনে আজলান বলেন—

ঃ "আমি রাবী'র কাছে একবার রাতযাপন করেছি, তিনি যখন নিশ্চিত হলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন, নামাযে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলেন—

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ - سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ - سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

অর্থ ঃ "যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবী কত মন্দ।"—জাসিয়া ঃ ২১

সে রাত তিনি নামাযের মধ্যেই কাটিয়ে দিলেন....

আয়াতটি তিনি একবার পড়ে শেষ করেন অতঃপর আবার পড়েন, এভাবেই সকাল পর্যন্ত তিনি নামাযই পড়তে থাকেন.....

তাঁর দু' চোখে যেন অশ্রুর বন্যা বয়ে যায়।"

* * *

রাবী' ইবনে খোসাইমের খোদাভীতি সম্পর্কে রয়েছে প্রচুর ঘটনা.....

তাঁর সমকালীন একদল লোক বর্ণনা করেছেন—

রাবী' ইবনে খোসাইম সহ আমরা একবার আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট থেকে ফিরে আসছিলাম। ফেরার সময় ফুরাত নদীর তীরবর্তী একটি বিশাল চুল্লির পাশ দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছিল, চুল্লিতে জ্বলছিলো দাউ দাউ আগুন।

চারদিকে উড়ে উড়ে পড়ছিলো সেই আগুনের ফুলকি....

যার লেলিহান শিখা অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠে যাচ্ছিলো....

যার হুঙ্কার ছড়িয়ে পড়ছিলো আশেপাশে....

চুল্লিতে ফেলা হয়েছিলো বড় বড় পাথর যা জ্বলতে জ্বলতে চুন হয়ে যাবে।

এই আগুন যখন রাবী' ইবনে খোসাইমের দৃষ্টিতে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তিনি থেমে গেলেন.....

তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হলো.....

কম্পিত কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন.....

اِذَا رَأَتۡهُمۡ مِّنۡ مَّكَانٍۭ بَعِيۡدٍ سَمِعُوۡا لَهَا تَغَيُّظًا وَّ زَفِيۡرًا وَاِذَاۤ اُلۡقُوۡا مِنۡهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيۡنَ دَعَوۡا هُنَالِكَ ثُبُوۡرًا –

অর্থ ঃ "অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। যখন এক শিকলে কয়েকজনকে বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে।" —ফুরকান ঃ ১২–১৩

অতঃপর সংজ্ঞা হারিয়ে তাঁর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

দীর্ঘ সময় আমরা তাঁর সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলাম। এরপর তাঁকে তাঁর বাড়িতে পৌছে দিলাম।

* * *

এই ঘটনার পর থেকে রাবী' ইবনে খোসাইম সারাজীবন ধরে মৃত্যুর

প্রতীক্ষা করেছেন এবং মৃত্যুকেই আলিঙ্গনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, তাঁর শিয়রে বসে তাঁর মেয়ে কাঁদতে লাগলো।

তিনি বললেন—

ঃ "কী ব্যাপার মামনি! তুমি কাঁদছ কেন? তোমার বাবার কাছে তো কল্যাণ এসেছে? !"

অতঃপর তিনি আপন প্রাণ সমর্পণ করলেন প্রাণস্রষ্টার কাছে.....

* * *

হে আল্লাহ! তুমি তাঁর সমাধিকে তোমার নূরে, রহমতে পরিপূর্ণ করে দাও।

ইয়াস ইবনে মুআবিয়া (রঃ)

আমরের বীরত্ব আর হাতেমের বদান্যতা,
আহনাফের সহনশীলতা, ইয়াসের বুদ্ধিমত্তাটাও।

—আবু তাম্মাম মুতানাব্বী

ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া আল মুযানী (রঃ)

সে রাতে 'উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) এক ফোটাও ঘুমাতে পারলেন না, বিছানায় শুধু এপাশ–ওপাশ করলেন, মুহূর্তের জন্যও দু' চোখের পাতা এক হলো না তাঁর, রাত্রটি তিনি বিনিদ্রই কাটালেন।

বসরা নগরীর কাজী নির্বাচনের চিন্তাটি দামেস্কের সেই শীতল রাতে আমীরুল মুমিনীনকে এমনই ব্যাকুল করে রেখেছিলো। তিনি পেরেশান হয়ে এমন একজন কাজী নির্বাচনের কথা ভাবছিলেন যিনি নিখুঁতভাবে মানুষের মাঝে ইনসাফের তুলাদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। যিনি নির্ভুলভাবে আসমানী বিধানের আলোকে তাদের মাঝে বিচার মিমাংসা করতে পারবেন, লোভ ও ভয় উভয়কে জয় করে যিনি হবেন দুর্জয়, দুর্বিনীত। হকের উপর যিনি হবেন পর্বতের মত অটল ও অবিচল।

প্রাথমিক নির্বাচনে তিনি বেছে নিয়েছেন এমন দুজনকে যাদের কোন একজনের নির্বাচন চূড়ান্ত করতে তিনি রীতিমত হিমশিম খাচ্ছেন। কারণ তাঁরা উভয়েই সমানে সমান। দ্বীনের বোধ ও চেতনায়, হকের ক্ষেত্রে অবিচলতায়.... চিন্তা ভাবনার দূরদর্শিতায়.....

দৃষ্টিভংগির তীক্ষ্ণতা ও জ্ঞানের গভীরতায়.....

তিনি একজনের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার মত একটি বৈশিষ্ট্য পেলে, অন্যজনের মধ্যেও পেয়ে যান তার মোকাবিলায় আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

এভাবে দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্বেই যখন ভোরের আলো ফুটে উঠলো, তখন তিনি তাঁর ইরাকের গভর্নর আদি ইবনে আরতাতকে—যিনি তখন তাঁর সঙ্গেই অবস্থান করছিলেন, ডেকে বললেন—

হে আদি.....

তুমি ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া আল মুযানী এবং কাসেম ইবনে রাবী'আ হারেসীকে ডেকে বসরা নগরীর বিচারক নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা কর। তাদের মতামত নিয়ে তাদের কোন একজনকেই এই দায়িত্ব অর্পণ কর।

তিনি বললেন—আমীরুল মুমিনীনের আদেশ শিরোধার্য....

* * *

আদি ইবনে আরতাত যথারীতি ইয়াস ও কাসেমকে ডেকে বললেন—

"আমীরুল মুমিনীন তোমাদের কোন একজনকে বসরার বিচারক নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আমি তোমাদের মতামত জানতে চাই....."

তারা উভয়েই বলতে লাগলেন—"আমি নই উনিই এই পদের জন্য বেশী যোগ্য।"

এই দাবীর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকেই যতদূর সম্ভব অন্যের ইল্ম, ফিকাহ ও মর্যাদা সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করলেন।

ইরাকের গভর্নর আদি বললেন—

"এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না করা পর্যন্ত তোমরা এখান থেকে উঠতে পারবে না।"

এ কথা শুনে ইয়াস বললেন—

"হে গভর্নর! আপনি আমাদের দুজন সম্পর্কে ইরাকের দুই বিখ্যাত ফকীহ হাসান বসরী[১] ও মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁরা দুজনই আমাদের দুজনকে ভালভাবে যাচাই করতে পারবেন।"

ব্যাপারটি ছিল এই যে, কাসেম উপরোক্ত দুই ফকীহের খিদমতে আসা-যাওয়া করতেন এবং ফকীহদ্বয়ও কাসেমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পক্ষান্তরে ঐ দু'জনের সঙ্গে ইয়াসের কোন সংযোগ বা পরিচিতি ছিলো না।

ফলে কাসেম বুঝতে পারলেন যে, আসলে ইয়াস চায় তাকে এই দায়িত্বে জড়িয়ে ফেলতে।

তিনি ভাবতে লাগলেন—

"গভর্নর যদি দুজনের কাছে পরামর্শ চান তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা ইয়াসকে বাদ দিয়ে আমার কথাই বলবেন......"

সুতরাং মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তিনি গভর্নরকে বললেন—

মহামান্য গভর্নর! আমাদের সম্পর্কে কাউকেই জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই।

"আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে ইয়াস

---

[১] হাসান বসরী (রঃ) বিখ্যাত তাবেঈ, তাঁর জীবনী দেখুন দ্বিতীয় খণ্ডে।

আমার তুলনায় বড় ফকীহ (জ্ঞানী) এবং বিচারকার্য সম্পর্কেও তিনিই অধিক জ্ঞাত......”

“আমার এই কসম যদি মিথ্যা হয়, তাহলে আপনার জন্য মিথ্যা শপথকারীকে বিচারক নিযুক্ত করা বৈধ হবে না।

আর যদি আমার কথা সত্যি হয়, তাহলে তো শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য ব্যক্তিকেই দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত।”

এবার ইয়াস (রঃ) গভর্নরের দিকে ফিরে বললেন—

“মহামান্য গভর্নর !......

আপনি এমন একজনকেই বিচারকের দায়িত্ব দিতে চাইলেন, যিনি এটাকে জাহান্নামের তীরে অবস্থান মনে করে সেখান থেকে নিজেকে একটি মিথ্যা কসম দিয়ে বাঁচিয়ে নিলেন। যেই মিথ্যা কসমের জন্য তার কোন দুঃখ নেই, কেননা ওর জন্য তিনি হাজারবার এস্তেগফার করবেন। বরং তিনি মহাখুশি, কারণ এর মাধ্যমেই এক মহাবিপদ থেকে তিনি বাঁচতে পারলেন।”

একথা শুনে আদি বললেন—

“যার সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাছে এত ভয়ঙ্কর চালাকীও ধরা পড়ে যায়, বিচারপতি পদের জন্য তিনিই সর্বাধিক যোগ্য এবং এই জটিল দায়িত্ব তাঁকেই শোভা পায়।”

অতঃপর ইয়াসকেই (রঃ) বসরা নগরীর বিচারক নিযুক্ত করলেন।

* * *

কে এই মহান ব্যক্তি, যাকে সর্বস্বত্যাগী খলীফা ‘উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) বসরা নগরীর বিচারপতি নির্বাচন করলেন?

কে এই বিরল ব্যক্তি, যার ধীশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বুদ্ধির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় হাতেম তাঈর বদান্যতা, আহনাফ ইবনে কায়েসের[১]

[১] আহনাফ ইবনে কায়েস—একজন বিখ্যাত তাবেঈ ও প্রসিদ্ধ সরদার। তিনি ছিলেন নিজ গোত্র তামীম এর নেতা, সহনশীলতায় তিনি ছিলেন একজন প্রবাদপুরুষ, মৃত্যু ৭২ হিজরী।

সহনশীলতা এবং আমর ইবনে মা'দী কারাব[২] এর বীরত্বের মত?

যেমন আহমাদ ইবনে মু'তাসিম এর প্রশংসায় আবু তাম্মাম মুতানাব্বী বলেছেন—

আপনার কত গুণাগুণ আর কত যে যোগ্যতা!
আমরের বীরত্ব আর হাতেমের বদান্যতা,
অযোগ্যতার নেই তো কিছুই আপনার কোথাও,
আহনাফের ধৈর্য আছে, আছে ইয়াসের বুদ্ধিমত্তাটাও।

প্রিয় পাঠক! এসো আমরা এই মহান পুরুষের জীবন কাহিনী গোড়া থেকে শুরু করি.....

কেননা এই মহান ব্যক্তির রয়েছে এক বিরল ও বর্ণাঢ্য জীবন চরিত।

* * *

ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া ইবনে কুররা আল মুযানী ৪৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান নজদের ইয়ামামা অঞ্চল।

নিজ পরিবারের সঙ্গেই জন্মস্থান ছেড়ে চলে আসেন বসরা নগরীতে। সেখানেই তিনি বেড়ে উঠেন এবং সেখানেই লাভ করেন প্রাথমিক শিক্ষা।

শৈশবেই তিনি বারবার দামেস্কে যাতায়াত করেন, সেখান থেকেই তিনি জীবিত সাহাবায়ে কেরাম এবং শীর্ষস্থানীয় তাবেঈদের নিকট থেকে লাভ করেন দ্বীন ও কুরআনের নির্ভুল শিক্ষা।

শৈশব থেকেই ইয়াসের স্বভাব চরিত্রে ফুটে উঠতো অনন্যসাধারণ আভিজাত্য ও বিস্ময়কর মেধার স্পষ্ট ছাপ।

তার বিভিন্ন দুর্লভ ও বিরল বিষয়ের আলোচনা মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতো সেই তখন থেকেই যখন তিনি ছিলেন একটি ছোট্ট বালক মাত্র.....

---

[২] আমর ইবনে মাদী কারাব—আরবের বিখ্যাত বীরপুরুষদের অন্যতম প্রধান, অন্য সকল বীরকে তাদের গোত্রের দিকে সম্বন্ধ করে বলা হলেও তাকে গোটা আরবের বীর বলে আখ্যায়িত করা হত। তিনি কাদেসিয়ায় তৃষ্ণার্ত হয়ে মারা যান।

বর্ণিত আছে যে, পাঠশালায় তিনি এক ইহুদীর কাছে অংক শিখতে যেতেন। একদিন সেখানে শিক্ষকের কাছে কয়েকজন ইহুদী বন্ধু এসে ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলতে লাগলো। বালক ইয়াস চুপচাপ বসে কান পেতে শুনতে লাগলেন তাদের সেই আলোচনা।

এক পর্যায়ে শিক্ষক তার বন্ধুদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন....

"তোমাদের কি একথা শুনে বিস্ময়বোধ হয় না যে, মুসলমানরা জান্নাতে খাওয়া-দাওয়া করবে, অথচ তাদের পেশাব পায়খানা হবে না ! !"

বালক ইয়াস তার দিকে ফিরে বললেন—

"হে মহামান্য শিক্ষক ! আপনাদের আলোচনার মাঝে আমাকে কি একটু বলার অনুমতি দেবেন ?"

শিক্ষক ঃ "বলো, কি বলতে চাও ?"

ইয়াস ঃ "পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের সবটুকুই কি মল, মূত্র হয়ে (বের হয়ে) যায় ?"

শিক্ষক ঃ "না, তা অবশ্য হয় না।"

ইয়াস ঃ "তাহলে যেটুকু শরীর থেকে বের হয় না, সেগুলো কোথায় যায় ?"

শিক্ষক ঃ "দেহের খোরাক হিসাবে (রক্ত, মাংস গঠনের) কাজে লেগে যায়।"

ইয়াস ঃ "পৃথিবীতেই যদি খাদ্যের কিছু অংশ দেহের খোরাক হতে পারে তাহলে জান্নাতে খাদ্যের সবটুকুই সে রকম হলে বিস্মিত হওয়ার কি আছে ?"

একথা শুনে ইহুদী লা জওয়াব হয়ে গেলো।

* * *

বালক ইয়াসের বয়স এক এক করে বাড়তে লাগলো আর একই সঙ্গে বেড়ে চললো তাঁর অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রতিভার খ্যাতি।

বালক বয়সে একবার তিনি গেলেন দামেস্ক নগরীতে, সেখানে

একটি পাওনা দাবী নিয়ে এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হলো, বৃদ্ধ তাঁর যুক্তি প্রমাণে খুশি হতে পারছেন না দেখে তিনি আদালতে যাওয়ার জন্য বৃদ্ধকে আহবান জানালেন।

উভয়ে কাজীর সম্মুখে উপস্থিত হলে ইয়াস তাঁর যুক্তি প্রমাণ পেশ করার উদ্দেশ্যে উঁচু আওয়াজে কথা বলতে লাগলেন....

এতে কাজী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

"আস্তে কথা বলো হে বালক!"

প্রতিপক্ষ বয়স ও মর্যাদায় তোমার চেয়ে বড়!

ইয়াস ঃ "কিন্তু আইন যে তাঁর চেয়েও বড়!"

এবার কাজী আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

ঃ "চুপ কর...." (যেন তিনি বলতে চান, তোমার মত পুচকের মুখে আইনের কথা মানায় না)

ইয়াস ঃ "আমি যদি চুপ করে থাকি তাহলে আদালতে আমার বক্তব্য তুলে ধরবে কে?"

কাজী এবার ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং রাগতঃ স্বরে বললেন—

ঃ "সেই যে আদালতে প্রবেশের পর থেকে তুমি শুধু আজে বাজে বকে চলেছো, ব্যাপারটা কী হাঁ?"

(এই পর্যায়ে ইয়াস বুঝতে পারলেন যে, কাজী সাহেবের ক্রোধের আগুনে পানি ঢালতে না পারলে তিনি আমার আর কোন কথাই শুনবেন না। সুতরাং তিনি তাৎক্ষণিক বুদ্ধি এঁটে বললেন—)

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু....লা-শারীকা লাহু...."

এটাও কি আমার আজে বাজে কথা?

এতে কাজী সাহেব একেবারেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন

ঃ "হক কথা....কা'বার প্রভুর কসম একেবারেই হক কথা....."

* * *

ইলম অর্জনে ইয়াস মুযানী ছিলেন এত গভীর অনুরাগী যে, এর জন্য তরুণ বয়সেই সব কিছু ত্যাগ করে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তারুণ্য সত্ত্বেও শুধুমাত্র অসামান্য জ্ঞানের কারণেই তাঁর সামনে প্রবীণ ব্যক্তিরাও নত হয়ে থাকতেন, তাঁর বক্তব্যে অকুণ্ঠ সমর্থন দিতেন, এমনকি অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব পর্যন্ত বরণ করে নিতেন।

একবার আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান খেলাফত লাভের পূর্বে বসরা নগরীতে গিয়ে দেখলেন, সেখানের এক অল্প বয়েসী তরুণ চার বৃদ্ধ আলেমের নেতৃত্ব দিচ্ছে, যার গোঁফের রেখা তখনও স্পষ্ট হয়ে উঠেনি।

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এই দৃশ্য দেখে বললেন—

ঃ "আফসোস এই সব দাঁতপড়া বুড়োর জন্য...."

এই নাবালক ছাড়া কি তাদের নেতৃত্ব দেবার আর কেউ ছিলো না?

এরপর তিনি ইয়াসের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন—

ঃ "এই বাচ্চা! তোমার বয়স কত?"

ইয়াস জবাব দিলেন—

জনাব! এখন আমার বয়স উসামা ইবনে যায়েদের[১] সেই বয়সের সমান যখন তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাপতি বানিয়েছিলেন। অথচ সেই সেনাদলের মধ্যে ছিলেন আবু বকর (রাঃ) ও উমরের (রাঃ) মত প্রবীণ সাহাবী।

একথা শুনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বলে উঠলেন—সাব্বাশ বেটা নওজোয়ান, সাব্বাশ! তুমি আরো এগিয়ে যাও, আল্লাহ তোমার উন্নতি দিন।

* * *

রমযানের চাঁদ দেখার জন্য একবার লোকজন রাস্তায় ভিড় জমালো, যাদের শীর্ষে ছিলেন প্রবীণ সাহাবী আনাস ইবনে মালিক (রাঃ).....

---

[১] উসামা ইবনে যায়েদের বয়স তখন কুড়ির নিচে।

সে সময় সাহাবী ছিলেন প্রায় শতবর্ষের অতি বৃদ্ধ একজন মানুষ।

আসমানে সবাই চাঁদ খুঁজতে লাগলো কিন্তু কারো চোখেই কিছু ধরা পড়লো না অথচ সাহাবী আনাস ইবনে মালিক স্থির দৃষ্টিতে আসমানের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—

ঃ "চাঁদ....চাঁদ..... ঐ যে দেখা যায়..... ঐ যে....."

এভাবে তিনি ইশারায় অনেককে দেখাতে চাইলেন কিন্তু কেউই কিছু দেখতে পেলো না।

তখন ইয়াস তাঁর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন, তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন—আসলে ঘটনাটি কী?

অতঃপর তিনি আদবের সঙ্গে সাহাবীর অনুমতি নিয়ে তাঁর ভ্রুতে হাতের মৃদু স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন। সাহাবীর চোখের সামনে ঝুলে থাকা লম্বা কেশটি সোজা করে দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ "এখনও কি চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন হে রাসুলুল্লাহর সাহাবী?"

কয়েকবার আসমানের দিকে তাকিয়ে তিনি লজ্জিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

ঃ "কই... আর তো দেখছি না, আর তো....."

ইয়াসের (রঃ) প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মেধার খ্যাতি যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো তখন চতুর্দিক থেকে মানুষ দলে দলে নানান প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগলো....

অনেকেই আসলো জানতে, কেউ তাঁকে ঠকাতে এবং কেউ ঠেকাতে, আবার কেউ আসলো আজে বাজে তর্ক করতে.....

একবার এক পণ্ডিত এলেন, মজলিসে এসে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন—

ঃ "মদ সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী?"

(তখন খেজুর ভেজানো পানি আগুনে জ্বাল করে মদ তৈরি হতো)

ঃ "হারাম"—ইয়াস (রঃ) উত্তর দিলেন।

ঃ "কিন্তু হারাম হওয়ার রহস্যটা কী?"

খেজুর, পানি এবং আগুনের উত্তাপ—এগুলো সবই তো হালাল, নয় কি? !

ঃ "আপনার বক্তব্য শেষ—না আরো কিছু বলবেন?"

ঃ" হ্যাঁ, আমার কথা শেষ....."

ঃ "আমি যদি এক অঞ্জলি পানি আপনার শরীরে ছুড়ে মারি তাতে কি আপনি ব্যথা পাবেন?"

ঃ "না, কোন ব্যথা পাব না।"

ঃ "আর যদি এক মুঠো ধুলো আপনার শরীরে মারি, তাতে কি ব্যথা পাবেন?"

ঃ "নাহ, মোটেও না।"

ঃ "যদি এক মুঠো পেক (কাদা) আপনার শরীরে মারি, তাতে? ব্যথা পাবেন?"

ঃ "এতে আবার কেউ ব্যথা পায় নাকি?" —পণ্ডিত সাহেবের জবাব।

ঃ "আর যদি সেই ধুলো, সেই পেক এবং সেই পানি একত্রে ছেনে এক দলা মাটি তৈরী করে সেটাকে রৌদ্রে শুকিয়ে সেই মাটির ঢেলা আপনার দিকে ছুড়ে মারি, তাহলে কি আপনার ব্যথা লাগবে?"

ঃ "লাগবে মানে? ঠিক মতো লাগলে তো পটলও তুলতে পারি! (মরেও যেতে পারি।)"

এবার ইয়াস (রঃ) বললেন—

ঃ "মদের ব্যাপারটাও এরকমই, তার হালাল অংশগুলোকে যখন আগুনের উত্তাপে মদ বানানো হয়, তখন সেটাই হারাম হয়ে যায়।"

* * *

ইয়াস (রঃ) বিচারকের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তাঁর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বলে দেয় তাঁর অসম্ভব মেধা ও অবিশ্বাস্য প্রতিভার কথা। প্রকৃত অপরাধীর মুখোশ উন্মোচনে তাঁর সূক্ষ্ম কৌশল জানান দেয় তাঁর অসম্ভব বুদ্ধিমত্তার কথা।

একবার দুজন লোক এলো তাঁর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে।

বাদী বললো—এই লোকটির কাছে কিছু টাকা আমি আমানত রেখেছিলাম কিন্তু সে এখন সেটা অস্বীকার করছে।

ইয়াস (রঃ) বিবাদীকে আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু লোকটি সোজা ভাষায় অস্বীকার করে বললো—

ঃ "বাদীর কাছে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ থাকলে পেশ করুক, নতুবা তার জন্য কসম ছাড়া আমি আর কিছু করতে পারবো না...."

ইয়াস (রঃ)এর আশঙ্কা হলো—লোকটি হয়ত কসমের মাধ্যমে আমানতের টাকাগুলো খেয়ানত (আত্মসাৎ) করে বসবে, তাই তিনি বাদীকে গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ "তোমরা কোথায় এবং কিভাবে লেনদেন করেছিলে?"

সে বললো—"অমুক জায়গায়..... যেখানে একটি বড় গাছ আছে, যার ছায়ায় বসে আমরা দুজনে খানা খেয়েছিলাম.... সেখান থেকে উঠার পূর্ব মুহূর্তে আমি তাকে টাকাগুলো আমানত দিয়েছিলাম।"

ইয়াস তাকে বললেন—

"তুমি দ্রুত সেই গাছটির নিকট চলে যাও, সেখানে গেলে হয়ত তোমার মনে পড়বে—তুমি আসলে টাকাগুলো কি করেছ, কিংবা কোথায় রেখেছো?"

এরপর ফিরে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

লোকটি চলে গেলো, এবার তিনি বিবাদীকে বললেন—

"লোকটি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না, এখানেই বসে থাকো।"

লোকটি বসে রইলো.....

অতঃপর তিনি অন্যদের (বিচারপ্রার্থীর) প্রতি মনোযোগ দিলেন। তাদের বিভিন্ন সমাধান দিতে থাকলেন, তবে মাঝে মাঝে চোরাচাহনী দিয়ে লোকটিকে তিনি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন.....

যেই দেখলেন লোকটির চেহারায় কিছুটা নিশ্চিন্ত ভাব ফুটে উঠেছে, আকস্মিক তাকে প্রশ্ন করে বসলেন—

ঃ "আচ্ছা, সেই গাছটির নিকট কি লোকটি পৌছে গেছে যেখানে তোমাকে টাকা দিয়েছিলো?"

ঃ "না-না, সেটা তো অনেক দূর...." লোকটির দ্রুত উত্তর।

তখন ইয়াস (রঃ) বললেন—

ঃ "আরে আল্লাহর দুশমন! তুমি যদি টাকা না নিয়ে থাক, তাহলে সেই জায়গাটি চিনলে কেমন করে?"

লোকটি ভ্যাবাচেকা খেয়ে শেষ পর্যন্ত টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করলো। এরপর বাদী ফিরে আসলে তার টাকা ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে তাদেরকে বিদায় দিলেন।

* * *

বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃত আসামী খুঁজে বের করার অসাধারণ ক্ষমতা ও নিখুঁত কৌশলের আরেকটি প্রমাণ হলো নিম্নোক্ত ঘটনা—

একবার দুজন লোক তাঁর কাছে বিচার চাইতে আসলো, যাদের বিরোধ ছিলো দুটি রুমাল নিয়ে। বড় রুমাল যা মাথার উপর থেকে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

রুমাল দুটির একটি ছিলো সবুজ রঙের নতুন ও দামী, অন্যটি ছিলো লাল রঙের পুরাতন।

বাদীর দাবী হলো—

"আমি আমার কাপড়-চোপড় ও সবুজ রুমালটি রেখে গোসলের জন্য একটি হাউযে নেমেছি। এমনি সময় আমার বিবাদী সেখানে এসে তার পুরাতন লাল রুমালটি আমার কাপড়ের পাশে রেখে গোসল করতে নামলো। সে আমার আগেই উঠে পড়লো এবং আমার নতুন সবুজ রুমালটি নিয়ে রওনা দিলো। আমি সঙ্গে সঙ্গেই তার পিছু নিলাম এবং আমার নতুন সবুজ রুমালের কথা বললাম কিন্তু সে দাবী করে বসলো—সবুজ রুমালটিই নাকি তার।"

ইয়াস (রঃ) বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ "তোমার বক্তব্য কী?"

ঃ "ওটা আমার রুমাল এবং আমারটাই আমার কাছে আছে।"

ঃ "তোমার কোন প্রমাণ আছে?"—তিনি বাদীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ "জ্বি না, আমার কোন প্রমাণ নেই।" বাদীর জবাব।

কাজী তার কর্মচারীকে একটি চিরুনী আনার নির্দেশ দিলেন।

অতঃপর তিনি উভয়ের চুল আঁচড়ালেন, একজনের মাথায় পেলেন লাল পশমী সুতার টুকরা, আরেক জনের মাথায় সবুজ টুকরা।

এরপর লাল টুকরাওয়ালাকে লাল রুমাল আর সবুজ টুকরাওয়ালাকে সবুজ রুমাল দিয়ে বিদায় করলেন।

* * *

তাঁর অনন্য প্রতিভা ও বিচার ক্ষমতার প্রমাণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আরো একটি ঘটনা—

ঘটনাটি কুফা নগরীর। সেখানের একলোক সবসময় মানুষের সামনে নিজের বুযুর্গী প্রদর্শন করে বেড়াতো। জনসমক্ষে কীরূপে মুত্তাকী, পরহেযগার সাজা যায় এটাই ছিলো তার নিরন্তর প্রচেষ্টা। এভাবে একসময় তার চেষ্টা সফল হলো, চারদিকেই তার প্রশংসা আর গুণগান শোনা যেতে লাগলো। অনেকেই সফরের সময় আমানতদার ও বিশ্বস্ত মানুষ হিসাবে তার কাছে নিজেদের মাল ও দৌলত আমানত রাখতে লাগলো। অনেকেই মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সন্তানদের জন্য তাকে অভিভাবক বানাতে শুরু করে দিলো।

এভাবেই এক ব্যক্তি তার কাছে কিছু অর্থ আমানত রাখলো। এরপর প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজের মাল ফেরৎ চাইলে লোকটি আমানতের কথা অস্বীকার করে বসলো।

আমানতকারী লোকটি ইয়াস (রঃ)এর আদালতে ঐ লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। তিনি অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ "অভিযুক্ত লোকটি কি জানে যে, তুমি আমার কাছে আসবে?"

ঃ "না হুজুর, সে কথা সে জানে না।" —লোকটি জবাব দিলো।

ইয়াস (রঃ) তাকে বললেন—আজ ফিরে যাও এবং আগামীকাল আবার আমার কাছে আসবে....

অতঃপর তিনি অভিযুক্ত লোকটিকে খবর দিয়ে আনলেন এবং বললেন—

ঃ "আমার কাছে এতীমদের বেশ কিছু মাল জমা হয়েছে, যে

এতীমদের কোন অভিভাবকও নেই। আমি মনে মনে ভেবেছি—আপনার কাছে ঐগুলো আমানত রাখবো এবং ঐ এতীমদের জন্য আপনাকেই অভিভাবক বানাবো, আপনার বাড়িটি কি নিরাপদ এবং এর জন্যকি আপনি সময় দিতে পারবেন?”

ঃ তিনি বললেন—জ্বি হাঁ মহামান্য আদালত! আমি খেদমতের জন্য তৈরী।

ইয়াস (রঃ) বললেন—

ঃ “তাহলে আপনি মালগুলো রাখার জায়গা ঠিক করে আগামী পরশু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন—

আর হাঁ, আসবার সময় বোঝা বহনের জন্য শক্তিশালী কয়েকজন কুলী নিয়ে আসবেন....”

পরের দিন অভিযোগকারী লোকটি আসলে ইয়াস (রঃ) তাকে বললেন— ঃ “তুমি লোকটির কাছে আবার গিয়ে তোমার আমানত ফেরৎ চাও, এবার যদি সে অস্বীকার করে তবে তাকে বলবে—“আমি কাজী সাহেবের কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো।”

কথামত লোকটি গিয়ে আমানত ফেরৎ চাইলো, এবারও সে অস্বীকার করলে আমানতকারী বললো—

ঃ “তাহলে কাজী সাহেবের কাছে তোমার বিরুদ্ধে বিচার চাইবো।”

দেখা গেলো আমানতদার লোকটি এতে ভীষণ ভড়কে গেলো এবং তাড়াতাড়ি তার অর্থ ফেরৎ দিয়ে হাতে পায়ে ধরে তাকে বলতে লাগলো—কাজীর কাছে কিছুতেই যেন বিষয়টি না জানানো হয়।

নিজের মাল ফেরৎ পেয়ে আমানতকারী (অভিযোগকারী) লোকটি কাজীকে ‘জাযা কাল্লাহ’ জানালো।

পরদিন অভিযুক্ত আমানতদার লোকটি যথাসময়ে কাজীর দরবারে একদল কুলী নিয়ে হাজির। ইয়াস (রঃ) তাকে তিরস্কার করলেন, ধমক দিয়ে বললেন—

ঃ “আল্লাহর দুশমন! তুই কতবড় নিকৃষ্ট লোক যে, আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়া শিকারের জাল বানিয়েছিস..... দূর হ এখান থেকে....”

* * *

কিন্তু এত উপস্থিত বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও অসামান্য মেধা সত্ত্বেও কখনো কখনো ইয়াস (রঃ) এমন মানুষের মুখোমুখী হয়েছেন যিনি যুক্তি দিয়ে তাঁর যুক্তিকে প্রতিরোধ করেছেন এবং যার সামনে তিনি লা জবাব হয়ে পড়েছেন....

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন—

ঃ কেউ কখনো আমাকে যুক্তি দিয়ে পরাজিত করতে পারেনি একটি মাত্র লোক ছাড়া। সেটা ছিলো এরকম যে, বসরা নগরীর আদালতে এজলাস চলাকালে এক সাক্ষী আমার সামনে বলতে লাগলো—"অমুক জায়গার বাগানটির আসল মালিক অমুক" একথা বলেই সে আমার কাছে বাগানটির সীমানা বর্ণনা করতে লাগলো।

আমার ইচ্ছা হলো—কেমন সাক্ষী, একটু যাচাই করে দেখি।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ঐ বাগানে কতগুলো গাছ আছে?

কিছুক্ষণ সে মাথা নিচু করে থাকার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—

ঃ "মাননীয় বিচারক! এই আদালতে আপনি কতকাল বিচার পরিচালনা করছেন?"

ঃ "বেশ, অনেক বছরই হবে...."

ঃ "এই আদালতের ছাদে কতগুলো মোটা মোটা কাঠ আছে?"

ঃ "আমি তো একেবারে লা জবাব হয়ে রইলাম, বললাম, তোমার বক্তব্যই যথার্থ...."

অতঃপর আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে ফয়সালা করে দিলাম.....

* * *

ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া (রঃ) যখন ৭৬ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তখন একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি এবং তাঁর পিতা উভয়েই দুটি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন। দুজনেই ঘোড়া দৌড়াচ্ছেন, কিন্তু কেউ কাউকে পিছে ফেলতে পারছেন না, তিনিও পিতার আগে যেতে পারলেন না, আর পিতাও তার আগে যেতে পারলেন না। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলো, তাঁর মনে পড়লো—তাঁর পিতার ইন্তেকাল হয়েছিলো ৭৬ বছর বয়সে।

একরাতে তিনি বিছানায় গেলেন এবং পরিবারের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ "তোমরা জান এটা কোন্ রাত?"

ঃ "না, আমরা তো কিছু জানি না"—সবাই জবাব দিলো।

তিনি বললেন—

এ রাতেই আমার পিতা তাঁর বয়সের পূর্ণতায় পৌঁছেছিলেন।

যখন ভোর হলো—সবাই দেখতে পেলো—

অসম্ভব প্রতিভাময়ী সেই জীবন আর নেই....

* * *

আল্লাহ তাআলা কাজী ইয়াস (রঃ)এর উপর রহম করুন, যিনি ছিলেন আপন যুগের এক বিরল ব্যক্তিত্ব। মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন ও বাস্তবতার আবিষ্কারে মেধা ও মননে, যোগ্যতা ও প্রতিভায় যিনি ছিলেন যুগের এক অসাধারণ বিস্ময়।

হে আল্লাহ! তোমার বিস্ময়কর রহমতের শুভ্র চাদরে
তাঁকে, তাঁর সমাধিকে আচ্ছাদিত করে দাও।

উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) ও আবদুল মালিক (রঃ)

তুমি কি জানোনা প্রতিটি গোত্রেই সম্ভ্রান্ত মানুষ থাকেন.... উমাইয়া গোত্রের সেই সম্ভ্রান্ত মানুষটি হলেন উমর ইবনে আবদুল আযীয। হাশরের ময়দানে তাঁকে উঠানো হবে পূর্ণ একটি জাতির মর্যাদায়.......

—মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রঃ)

‘উমর ইবনে আবদুল আযীয এবং তাঁর পুত্র আবদুল মালিক (রঃ)

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) এইমাত্র পূর্ববর্তী খলীফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের দাফন শেষ করলেন। তাঁর হাতে এখন পর্যন্ত লেগে আছে কবরের মাটি। ঠিক এমনি মুহূর্তে তিনি অনুভব করলেন—আশেপাশে কিসের যেন কম্পন আর সেই সাথে চাপা গর্জন—

ঃ কী হলো? !—বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! এটা খলীফার জন্য তৈরী বিশেষ এক দ্রুতযানের শব্দ, আপনাকে বহন করার জন্য এইমাত্র যেটা এখানে নিয়ে আসা হয়েছে.....

উপস্থিত লোকদের মুখে একথা শুনে তিনি চোখের কোণ দিয়ে একবার সেদিকে তাকালেন এবং তাঁর কম্পিত ও ভগ্ন আওয়াজে—অনিদ্রা ও ক্লান্তি যাকে দুর্বল ও ক্ষীণ করে তুলেছে, বললেন—

ঃ ওটা দিয়ে আমি কী করবো? !

আমার সামনে থেকে সরাও ওটা, আল্লাহ তোমাদের বরকত দিন....

আমার খচ্চরটা নিয়ে এসো, ওতেই আমার চলবে.....

তিনি খচ্চরের পিঠে চড়ে বসলেন, তখন তাঁর সামনে এগিয়ে আসলো পুলিশ প্রধান সহ একদল পুলিশ, যাদের প্রত্যেকের হাতে শোভা পাচ্ছিলো চকচকে বর্শার ফলা....

খলীফাকে শক্ত প্রহরার মধ্যদিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য।

পুলিশ প্রধানের দিকে ফিরে তিনি বললেন—

আপনাকে এবং আপনার এই বাহিনীকে ধন্যবাদ,

আমার কোন প্রহরীর প্রয়োজন নেই।

কারণ আমি সব মুসলমানের মতই একজন ব্যক্তি মাত্র......

তাদের রাত-দিন আর আমার রাত-দিনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।......

একথা বলে তিনি সেখান থেকে রওনা করলেন, তাঁর পিছে পিছে রওনা দিলো উপস্থিত সব লোক।

খলীফা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন।

লোকেরা উচ্চস্বরে ঘোষণা শুনতে পেলো—

নামায..... নামায......

সুতরাং সব দিক থেকে যেন ঢল নেমে এলো মানুষের, কানায় কানায় ভরে উঠলো মসজিদ।

জনাকীর্ণ সেই সমাবেশে পিন পতন নিরবতার মাঝে খলীফা উঠে দাঁড়ালেন খুতবা (ভাষণ) দিতে।

প্রথমে আল্লাহর হামদ–ছানা অতঃপর রাসূলের প্রতি দুরূদ পাঠ করে তিনি বললেন—

হে লোকসকল ! আমাকে আমার বিনা সম্মতিতে[১]

বিনা আবেদনে

এবং মুসলমান জনসাধারণের পরামর্শ[২] ছাড়া.....

একটি সুকঠিন দায়িত্বের জালে (খেলাফতের দায়িত্বে) জড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

আমি আপনাদেরকে সেই শপথের ভারমুক্ত করে দিচ্ছি, যা আপনাদের স্কন্ধে অর্পিত রয়েছে।

অতএব, আপনারা পসন্দনীয় একজন খলীফা নির্বাচন করে নিন।

উপস্থিত জনতা সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠলো—

আমরা আপনাকেই নির্বাচন করেছি হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনিই আমাদের পসন্দনীয় খলীফা।......

আপনিই দয়া করে ক্ষমতা গ্রহণ করুন.....

---

১ বিনা সম্মতি—একথা বলে তিনি ইংগিত দিয়েছেন যে, তিনি খেলাফতের প্রার্থী ছিলেন না অথবা পূর্বসূরী কর্তৃক তাঁর প্রতি উহা অর্পণ করে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি অবগত ছিলেন না।

২ এতে ইংগিত রয়েছে যে, পূর্বসূরী খলীফা তাঁর পক্ষে জনতার বাইআত নিয়ে গেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ না করেই।

তিনি যখন দেখলেন—আওয়াজ শান্ত হয়ে গেছে এবং সকলেই তাঁর প্রতি আস্থা জানিয়েছেন, তখন তিনি পুনর্বার আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা পড়লেন এবং রাসূলের প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠালেন।

অতঃপর জনগণকে তাকওয়া ও পরহেযগারীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন, তাদেরকে দুনিয়ার লোভ–লালসা ত্যাগ করার উপদেশ দিলেন।.....

আখেরাতের আগ্রহ তাদের মাঝে জাগিয়ে তুললেন....

মৃত্যুর কথা এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় স্মরণ করিয়ে দিলেন, যা পাষাণ হৃদয়কে গলিয়ে দেয়, অবাধ্য 'পাপী চোখে' ঢল নামায়, যে ভাষা বক্তার হৃদয় থেকে বেরিয়ে শ্রোতাদের হৃদয়ভূমে স্থায়ী আবাস গড়ে নেয়।

এরপর তিনি ক্লান্ত স্বর খানিকটা চড়িয়ে চিৎকার করে বললেন—

হে লোকসকল ! যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে ; তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব।

যে আল্লাহর নাফরমানী (হুকুম অমান্য) করে ; তার আনুগত্য করা কারোরই কর্তব্য নয়.....

হে লোকেরা ! যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করব আপনারা আমার আনুগত্য করবেন।

যখন আমি আল্লাহর নাফরমানী করব তখন আমার আনুগত্য আপনাদের জন্য বৈধ হবে না।

অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন। বাড়ি গিয়ে নিজ কামরায় প্রবেশ করলেন।

পূর্ববর্তী খলীফার মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে অসম্ভব ও বিরামহীন কষ্টের পর এইমাত্র তিনি একটু বিশ্রামের কথা ভাবতে পারলেন।

* * *

কিন্তু বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়া মাত্রই সেখানে হাজির হলেন তাঁর পুত্র আবদুল মালিক। মাত্র সতের বছর বয়েসী এই ছেলে বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—

ঃ এখন আমীরুল মুমিনীন কি করতে চান? ! !

তিনি জবাব দিলেন—

ঃ বেটা ! আমি সামান্য একটু ঘুমুতে চাই ; কেননা আমি ভীষণ ক্লান্ত, আমার শরীরে এক ফোটাও শক্তি নেই।

ছেলে একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা ও বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—

ঃ আমীরুল মুমিনীন ! আপনি মজলুমের হক পৌঁছে দেয়ার আগেই ঘুমাতে চাচ্ছেন? !

তিনি জবাব দিলেন—

ঃ বেটা ! তোমার মরহুম চাচার কারণে গতরাতে আমার একমুহূর্তও ঘুমানো হয়নি....

তাছাড়া যোহরের সময় তো মসজিদে যাবই তখনই ইনশাআল্লাহ মজলুমের ফরিয়াদ শুনব।

ছেলে বললেন—একেবারে সরাসরি—

ঃ কিন্তু আমীরুল মুমিনীন ! আপনি যোহর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন, তার নিশ্চয়তা দেবে কে? !

এই কথা উমরের (রঃ) ক্লান্ত চেতনায় ঘা দিয়ে জাগিয়ে তুললো, পরিশ্রান্ত শরীরে প্রাণের সঞ্চার করলো, অবসন্ন দেহে নতুন শক্তি ও নতুন সংকল্পের জন্ম দিলো।

যার তাড়া খেয়ে তাঁর দু'চোখের ঘুমেরা মুহূর্তে পালিয়ে গেলো।

তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন—

বেটা ! তুমি আমার কাছে এসো।

এরপর তিনি তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে কপালে চুম্বন করলেন। অভিভূত হয়ে বললেন—

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি আমার ঔরসে সৃষ্টি করছেন এমন সন্তান যার মাধ্যমে আমার দ্বীন সজীব হয়েছে।

এরপর তিনি প্রস্তুত হয়ে নির্দেশ দিলেন—

মজলুমের ফরিয়াদ নিয়ে আসতে বলা হোক.....

* * *

তাহলে কে এই আবদুল মালিক?!

কীই বা বৈশিষ্ট্য এই তরুণের যার সম্পর্কে বহু মানুষ মন্তব্য করেছেন.....

এই ছেলে তাঁর বাবাকে পৌঁছে দিয়েছেন ইবাদতের এত গভীরতায়.....

তাঁকে পথিক বানিয়েছেন অবর্ণনীয় যুহুদ ও তাকওয়ার......

এসো এই ঈর্ষণীয় সুবোধ ও সৎ তরুণের কাহিনী আমরা গোড়া থেকে শুরু করি।

* * *

তিন কন্যা সহ উমর ইবনে আবদুল আযীযের (রঃ) ছিলো মোট পনেরটি সন্তান....যারা সকলেই ছিলেন তাকওয়া ও পরহেযগারীর বিরল সম্পদে ঐশ্বর্যবান এবং যারা সকলেই আরোহণ করেছিলেন ইসলাহ ও সংশোধন, সততা ও সাধুতার উচ্চ শিখরে। কিন্তু আবদুল মালিক ছিলেন যেন এই সব নক্ষত্রের মাঝে একটি ধ্রুবতারা।

তিনি ছিলেন একজন ভদ্র ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, বয়সে তরুণ কিন্তু বুদ্ধিতে ছিলেন প্রবীণ।

শৈশব থেকেই তাঁর লালন পালন ও বর্ধন ঘটেছিলো ইবাদত বন্দেগীর সৌরভ মাখা এক পুণ্য পরিবেশ ও প্রতিবেশে। যারফলে তার সাধারণ গুণ বৈশিষ্ট্যগুলো ছিলো খাত্তাব বংশের সর্বাধিক নিকটতম। কিন্তু তাঁর খোদাভীতি, গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও ইবাদতের আকর্ষণ ছিলো বিশেষতঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সঙ্গেই সর্বাধিক তুলনীয়।

* * *

তাঁর চাচাতো ভাই আছেম[১] বর্ণনা করেন—

---

[১] আছেম—উমর ইবনে আবদুল আযীযের ভ্রাতুষ্পুত্র।

আমি একবার দামেস্কে গেলাম এবং সেখানে গিয়ে উঠলাম আমার চাচাতো ভাই আবদুল মালিকের গৃহে। যথারীতি আমরা এশার নামায পড়ে বিছানায় গেলাম। (আবদুল মালিক তখনও অবিবাহিত।)

আবদুল মালিক উঠে বাতি নিভিয়ে দিলেন।

এরপর আমরা উভয়েই গভীর নিদ্রার রাজ্যে হারিয়ে গেলাম....

মধ্যরাতে যখন আমার ঘুম ভাঙ্গলো তখন অন্ধকারের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম। আবদুল মালিক বিছানায় নেই, তিনি নামাযে। তাঁর চাপা কান্নার মধ্যদিয়ে শুনতে পেলাম কোরআনের এই আয়াত—

اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ - ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ - مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ -

অর্থ ঃ "আপনি ভেবে দেখুন তো যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ বিলাস করতে দেই, অতঃপর যে বিষয়ে তাদের ওয়াদা দেওয়া হত তা তাদের কাছে এসে পড়ে। তখন তাদের ভোগ-বিলাস তা তাদের কি উপকারে আসবে?"—আশ-শো'আরা ঃ ২০৫-২০৭

আয়াতগুলোর বারংবার তেলাওয়াত ও সংবরণকৃত কান্নার দমকে আমি শংকিত হয়ে উঠলাম, হয়ত তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে।.....

আয়াত যখনই একবার শেষ হচ্ছিলো তিনি পুনরায় শুরু করছিলেন।

এভাবে অবদমিত কান্নায় যখন তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবার তীব্র আশংকা হলো তখন আমি ঘুম থেকে জেগে উঠা মানুষের মতকরে বললাম—

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালহামদুলিল্লাহ।

এতে তিনি থেমে গেলেন এবং আর কোন আওয়াজ পেলাম না।

* * *

এই তরুণ তাঁর সময়ের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং কুরআন-হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে অর্জন করেন এমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য যে, সিরিয়ার তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ফুকাহায়ে কেরাম

পর্যন্ত তাঁর দরবারে ভিড় জমিয়ে রাখতেন।

একবার উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) সিরিয়ার আলেম ও ফকীহদের এক সমাবেশ ডাকলেন এবং সবাই উপস্থিত হলে তিনি বললেন—

আমার পরিবারের লোকদের হাতে পূর্বসূরী শাসকবর্গের অপহরণকৃত যে সব সম্পদ রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আমার করণীয় ইত্যাদি জানার জন্য আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আপনারা বলুন, আপনাদের মতামত কী?

তারা বললেন—

আমীরুল মুমিনীন! আপনার চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা পূর্বসূরীদের জবর দখল নিঃসন্দেহে আপনার কর্তৃত্বের বহির্ভূত।.....

এবং এইসব অপহরণের দায়ভার নিশ্চয়ই তাদের উপরই বর্তাবে যারা এ অপকর্ম করেছে.....

তাদের এই উত্তরে তিনি খুশি হতে পারলেন না.....

উপস্থিত একজন ভিন্নমত পোষণকারী আলেম তাঁর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—

আমীরুল মুমিনীন! আপনি আবদুল মালিককে ডেকে তাঁর মতটিও একবার শুনুন। কারণ ইলম, ফেকাহ ও বুদ্ধিমত্তার সকল বিবেচনায়ই তিনি আমন্ত্রিতদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য।

আবদুল মালিক সেখানে প্রবেশ করলে খলীফা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—

আমাদের চাচাতো ভাইয়েরা বলপূর্বক মানুষের যেই সম্পদগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে, সেগুলোর মালিকেরা ফরিয়াদ নিয়ে এসেছে এবং যাদের হক সম্পর্কে আমরাও নিশ্চিত হয়েছি, সেগুলো সম্পর্কে তোমার মত কী?

তিনি বললেন—

আমি মনে করি যেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হয়েছেন, সুতরাং সেগুলো যথাযথ মালিকদের হাতে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া উচিত অন্যথায় আল্লাহর আদালতে আপনার নামটিও জবর দখলকারীদের

তালিকায় লিখে নেওয়া হবে।

উমর ইবনে আবদুল আযীযের (রঃ) সকল জিজ্ঞাসার জট খুলে গেলো। চিন্তার কালো মেঘ কেটে গিয়ে তাঁর হৃদয় আকাশ স্বচ্ছতায় ভরে উঠলো।

* * *

এই উমরী নওজোয়ান সবসময় সীমান্ত প্রহরাকে প্রাধান্য দিতেন—

এজন্য সিরিয়ার অধিবাসী হিসাবে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী কোন শহরে বাস করাই ছিলো তাঁর বেশী পসন্দ।

সুতরাং তিনি নিজস্ব বাসস্থান দামেস্কের বিস্তীর্ণ সবুজের সমারোহ, ঘন ছায়াঘেরা বনাঞ্চল ও সপ্তনদীর মনোরম পরিবেশ পিছনে ফেলে ছুটে যেতেন ঐ সীমান্ত রক্ষার কঠিন দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে।

তাঁর বাবা ছেলের পরহেযগারী ও সাধুতার সব খবর জানা সত্ত্বেও তার উপর শয়তানী প্রভাবের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন, ভীষণ শংকিত থাকতেন। যৌবন বয়সের বিভ্রান্তির কথা ভেবে তিনি ছেলের সকল বিষয়ের প্রতি কড়া নজর রাখতেন। কখনোই তার ব্যাপারে অসতর্কতা ও অবহেলা দেখাতেন না।

* * *

উমর ইবনে আবদুল আযীযের (রঃ) একজন মন্ত্রী বিচারক ও উপদেষ্টার নাম—মায়মুন ইবনে মাহরান, তিনি বর্ণনা করেন—

আমি একবার উমর ইবনে আবদুল আযীযের (রঃ) নিকট গিয়ে দেখলাম তিনি ছেলের নিকট চিঠি লিখছেন। ছেলে আবদুল মালিককে উপদেশ, হিতাকাঙ্খা, পরামর্শ, সাবধানবাণী ও ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছেন—

'যারা আমার নিকট শিক্ষা অর্জন করেছে এবং যারা সবচেয়ে বেশী আমাকে বুঝতে পারে তাদের মধ্যে তুমিই সর্বাধিক যোগ্য। আল্লাহ

পাকের প্রশংসা যে, তিনি আমাদের ছোট, বড় সকল কাজে অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ রেখো।

আর সাবধান! আত্মঅহঙ্কার ও আত্মগর্বের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে, কেননা ওটা শয়তানের স্বভাব আর শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য দুশমন.....

মনে রেখো, তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি আজ এ চিঠি শুধু সেজন্যই লিখছি,কারণ আমিতো তোমার সম্পর্কে এযাবৎ শুধু ভালোই শুনে এসেছি।

তবে এবার আমার কানে তোমার ব্যাপারে একটি সংবাদ এসেছে সেটা তোমার আত্মশ্লাঘার বিষয়ে......

তোমার ভিতরে যদি এই আত্মশ্লাঘার জন্ম হয়ে থাকে—যা আমি মোটেও পসন্দ করি না, তাহলে তুমি আমার এমন আচরণই দেখতে পাবে যা তোমার মোটেও পসন্দ হবে না....'

মায়মুন বলেন—

এই চিঠি লিখবার পর উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) আমার দিকে ফিরে বললেন—

হে মায়মুন! আমার নিজের ছেলে আবদুল মালিককে আমার চোখে ভালই লাগে, এতে আমি নিজেকে অভিযুক্ত মনে করি এবং আমার আশঙ্কা হয়—না জানি আমার বাৎসল্য তার শাসনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো কিনা এবং এই বাৎসল্যই তার দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে আমাকে অন্ধ করে দিলো কিনা, যা সব বাবাকেই করে থাকে?

সুতরাং তুমি তার কাছে যাও, গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানার চেষ্টা কর যে, আসলে তার মধ্যে আত্মঅহঙ্কার আছে কিনা? সে একটি অল্পবয়েসী ছেলে বলেই আমি সবসময় আশঙ্কায় থাকি—নাজানি কখন কোন্ দিক থেকে শয়তানের খপ্পরে পড়ে যায়?

মায়মুন বলেন—

আমি গেলাম তার কাছে, অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলাম তার গৃহে, আমার মনে হলো—বিনয়ের আকড়, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল মসৃণ

চেহারার এক চমৎকার তরুণকে আমি দেখছি। সে বসে আছে পশমী চাদর বিছানো একটি শুভ্র তোষকের উপর।

আমাকে অভিবাদন জানিয়ে সে বললো—

বাবার মুখে আপনার অনেক উত্তম গুণ ও প্রশংসা শুনেছি। আজ আপনার সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হওয়াতে বুঝতে পারছি আপনি সে প্রশংসার যথার্থই উপযুক্ত ব্যক্তি। আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ্ আপনার সান্নিধ্যে আমার যথেষ্ট কল্যাণ হবে।

আমি তাকে বললাম—তোমার নিজের কথা কিছু শোনাও।

সে বললো—আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর নেয়ামতের মধ্যে ভালই আছি।

তবে আমি আশঙ্কা করি আমার প্রতি বাবার সুধারণা আমাকে প্রবঞ্চিত করে ফেলে কিনা এবং তাঁর সুধারণার মর্যাদা আমি রক্ষা করতে পারি কিনা? আমার ভয় হয় আমাকে বুঝতে বা শাসন করতে তাঁর বাৎসল্য বাধা হয়ে যায় কিনা?

"তেমন হলে তো আমিই হবো তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় আপদ" —একবারেই কথাগুলো বলে তিনি থামলেন।

বাপ-বেটার চিন্তার এই মিল দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

এরপর জিজ্ঞাসা করলাম—

ঃ তোমার জীবিকার উৎস কি?

ঃ বৈধ মালিকের থেকে হালাল অর্থে কেনা একখণ্ড যমীনের ফসল, যার বদৌলতে আমি মুসলমানদের ট্যাক্সের অর্থ থেকেও মুক্ত।

ঃ তোমার খাদ্য তালিকা কেমন?

ঃ কোন রাতে শুধু সামান্য গোস্ত.... কোন রাতে ডাল ও যায়তুন কোন রাতে সামান্য সিরকা ও যায়তুন....

এতে আমার বেশ চলে যায়।

ঃ তোমার মাঝে কি আত্ম প্রশংসা (আত্মশ্লাঘা) জাগে?

ঃ কখনো কখনো কিছুটা জাগতো, কিন্তু আমার বাবা আমাকে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটা আমার চোখে আমার নফসের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছে এবং আমার চোখে আমার মর্যাদা খাটো করে দিয়েছে।......

তাঁর উপদেশে আল্লাহ আমার কল্যাণ করেছেন, ফলে আমি প্রার্থনা

করছি আল্লাহ তাঁকে (পিতাকে) উত্তম জাযা (বিনিময়) দান করুন।

এরপর আরো কিছু সময় আমি তার কাছে বসলাম। তার কথা শুনে আমার এতই ভালো লাগলো যে, আমার মনে হলো—

এত চমৎকার যুবক আমি আর কখনো দেখিনি....

তার অল্পবয়স ও সামান্য অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমার মনে হলো—

এত সুরুচী ও সৌজন্যবোধসম্পন্ন, অমায়িক ভদ্র এবং এত বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ আমার জীবনে আর কখনো মেলেনি।

এরপর দিনের শেষ বেলায় একটি ছেলে এসে তাঁকে বললো—

ঃ আমরা শেষ করেছি আপনি আসুন....

ঃ আচ্ছা আমি আসছি....

ঃ ওরা কী শেষ করার খবর দিলো?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

ঃ হাম্মামখানার ভিড়......

ঃ বুঝতে পারলাম না, ওরা কী করেছে?

ঃ হাম্মামখানায় লোকের ভিড় হয়, আমার জন্য ওরা সেটা খালি করেছে, সেই খবর নিয়ে এসেছিলো ছেলেটি।

ঃ তুমি তো ইতিমধ্যেই আমার মনে একটি উঁচু আসন করে নিয়েছিলে। কিন্তু এখন এটা কী শুনছি..... !?

তার মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠলো, সে 'ইন্না লিল্লাহ' বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—

ঃ "কিন্তু এতে সমস্যা কি?"

ঃ "হাম্মাম কি তোমার নিজের?"—আমি তাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলাম।

ঃ "না, আমার না কিন্তু তাতে অসুবিধা কি?"

"হাম্মাম যদি তোমার না হয় তাহলে তুমি সেখান থেকে লোকদেরকে কোন্ অধিকারে ফিরিয়ে দাও?"

এতেতো বোঝা যায় তুমি অন্যদের সামনে নিজেকে বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হিসাবে প্রকাশ করতে চাও.....

তাছাড়া লোকদের ফিরিয়ে দিয়ে তুমি তো মালিকেরও ক্ষতি করছো। সে তাদের ভাড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঃ "কিন্তু আমি তো মালিকের ঐ দিনের পূর্ণ ভাড়াই পরিশোধ করে থাকি।"

ঃ তাহলে তো অহঙ্কারের সঙ্গে অপচয়ও যুক্ত.....

"তুমি যদি নিজেকে অন্যদের মতই মনে কর, তাহলে তারা থাকতেই তোমার যেতে অসুবিধা কোথায়?"

ঃ আমার অসুবিধা হলো—এখানে একদল গেঁয়ো লোক আছে, যারা বিবস্ত্র হয়ে হাম্মামে প্রবেশ করে, এই অবস্থায় সেখানে গিয়ে তাদেরকে দিগম্বর দেখতে আমার খুব কষ্ট হয়।......"

আমি যে তাদেরকে পোশাকের জন্য বাধ্য করবো, সেটাও আমার ভাল লাগে না, কেননা তারা এটাকে আমার অনধিকার চর্চা ধরে নেবে, যা থেকে আমি আল্লাহর কাছে সবসময়ই পানাহ চাই।

যাই হোক আপনি আমাকে সমাধান বলে দিন.....

এবং আমার সংশোধনের জন্য কিছু উপদেশ দিন।

আমি বললাম—

ঃ "তুমি অপেক্ষা করতে থাকবে, সবলোক কাজ সেরে চলে গেলে, রাতের বেলা তুমি হাম্মামে যাবে।"

ঃ সে বললো—"আমার আপত্তি নেই...."

এখন থেকে আর কখনই দিনের বেলা হাম্মামে যাবো না, এমনকি এটা যদি শীত প্রধান এলাকা না হতো তাহলে আদৌ আর কখনো হাম্মামেই যেতাম না। একথা বলে সে একটু মাথা নিচু করলো যেন কিছু একটা ভাবছে—

এরপর মাথা উঠিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো—

ঃ আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি—এই খবরটি আমার বাবাকে বলবেন না, আমি চাই না তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান.....

কারণ আমার ভয় হয় যদি ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ না আসতেই আমার মৃত্যু এসে যায়।

মায়মুন বলেন—

আমার ইচ্ছা হলো, আমি তার কিছুটা বুদ্ধির পরীক্ষা নেই, সুতরাং

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

ঃ আমীরুল মুমিনীন যদি জানতে চান তোমার কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়েছে কিনা? তুমি কি চাও আমি তখন মিথ্যা বলবো?!

ঃ নাউযুবিল্লাহ, তা আমি চাই না—

তবে ইচ্ছা করলে আপনি এভাবে জবাব দিতে পারেন—

হাঁ সেরকম একটি বিষয় আমার চোখে পড়েছিলো বটে, তবে আমি উপদেশ দেওয়াতে দেখেছি তার মধ্যে অনুতাপ এসেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে সংশোধন করে নিয়েছে নিজেকে।

এতে আপনি যেটা প্রকাশ করলেন না সেটাকে আমার বাবা আর প্রকাশ করতে বলবেন না।

কেননা আল্লাহ তাঁকে গোপন বিষয় উদঘাটনের ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছেন।

মায়মুন বলেন—

আমি তাদের মত এমন চমৎকার পিতা ও পুত্র আর কখনো দেখিনি। আল্লাহ তাদেরকে রহম করুন।

* * *

খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম ব্যক্তি হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)এর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করেছেন এবং করবেন......

* * *

হে আল্লাহ!

তুমি তাঁর সমাধিকে সমুজ্জ্বল করো, আলোকিত করো এবং আলোকিত করো তাঁর কলিজার টুকরা পুত্র আবদুল মালিকের সমাধিকে.......

তাঁদের দুজনের জন্যই সালাম যে দিনে মহান প্রভুর সঙ্গে তাঁদের মিলন হয়েছে......

তাঁদের দুজনের জন্য সালাম সেইদিন যেদিনে তাঁদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে সকল পুণ্য পথের যাত্রীর সাথে......

সমাপ্ত

আলোর মিছিল

প্রথম খণ্ড

মূল ঃ ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)
অনুবাদ ঃ হাফেজ মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-৪১৭৬৪, ০১৭১-২৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল
তৃতীয় মুদ্রণ ঃ এপ্রিল ২০০৬ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৩ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ ঃ নভেম্বর ১৯৯৯ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ রিয়াজ হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-02-4

মূল্য ঃ সত্তর টাকা মাত্র

ALOR MICIL (First PART)
By : Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha (Rh.)
Translated by : Mawlana Masoodur Rahman
Price Tk. 70.00 US $ 5.00 only

‘আলোর মিছিল’-তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

হ্যাঁ, আলোর মিছিল’ই বটে,

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াততো পুরোপুরিই আলো, আবার তাঁর ঈমানী শিক্ষা যার দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি আর তাঁদের মাধ্যমে তাবেঈগণ জীবন আলোকিত করেছিলেন, সেটাও ছিলো এক সমুজ্জল আলো। সুতরাং আঁধার এই পৃথিবীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ছিলেন যথার্থই সমুজ্জল আলোর মিছিল।

আলোর মিছিল গ্রন্থখানি তাবেঈদের জীবন-চরিতমূলক একটি শ্রেষ্ঠ রচনা, যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে হিদায়াতের আলো। এতে রয়েছে বিখ্যাত তাবেঈদের ঈমান দীপ্ত চমৎকার জীবন কাহিনীর দ্যুতিময় উপস্থাপনা। আলোর মিছিল তার পাঠককে শোনায় তাঁদের তাকওয়া-পরহেযগারী, সংযম-সাধনা ও নিষ্ঠার শ্লোগান। প্রতিটি জীবনীই বিবৃত করে তাঁদের মৃত্যুর স্মরণ, মানবকল্যাণ ও অপূর্ব আত্মত্যাগপূর্ণ পবিত্র জীবনের জয়গান। আলোর মিছিলের প্রতিটি কাহিনীই পাঠক হৃদয়ে রেখে যায় জীবন গঠন ও আত্ম উন্নয়নের এক দীপ্ত আহবান।

মহান ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী পড়তে যারা ভালবাসেন, আলোর মিছিল তাদের সেই ভালবাসাকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দেবে আরো বহুগুণ। এমনকি যারা জীবন কাহিনী পড়তে অপছন্দ করেন ‘আলোর মিছিল’ তাদেরও অপছন্দ হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সবশেষে বলি-দ্বীন ইলসলামও একটি আলো যারা সে আলোকে পছন্দ করেন কিংবা যারা মুসলমান হয়েও ক্ষণিকের মোহে সে আলো থেকে সরে আছেন দূরে-অন্ধকারে, সকলের কাছেই আমন্ত্রণ রইলো আসুন শামিল হই “ আলোর মিছিলে।”

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৩/৬, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০